জ্যোতিরিন্দ্রনাথের
জীবন-স্মৃতি

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত

কলিকাতা
কলেজ-ষ্ট্রীট মার্কেট, শিশির-পাব্‌লিশিং-হাউস্‌, হইতে
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ফাল্গুন, ১৩২৬

মূল্য দুই-টাকা।


প্রিণ্টার-শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মানসী প্রেস
১৪।এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা।

গঙ্গাজলেই গঙ্গা-পূজা করিলাম—

লেখক

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবন-কথা সন ১৩২১ সালে, বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত, ধারাবাহিকভাবে "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। মাননীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী মহাশয়া তখন "ভারতী"র সম্পাদিকা ছিলেন। কাগজের দুর্ম্মূল্যতা এবং মুদ্রণ-সংক্রান্ত যাবতীয়-দ্রব্যের মহার্ঘতাহেতু নানাকারণে, এতদিন গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিতে পারি নাই।

১৩১৯ সালের শ্রাবণ মাসে "সাহিত্যরথী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ" ও ১৩২১ সালের ফাল্গুনে প্রকাশিত "জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি"র শেষাংশটুকু, গ্রন্থের সুসঙ্গতি রক্ষার্থে 'সূচনা'য় দিয়াছি। এতদ্ব্যতীত, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, "জীবন-স্মৃতি"র বহুল অংশকে এই গ্রন্থ মধ্যে পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্জ্জিত এবং পরিবর্ত্তিত আকার দান করা হইয়াছে।

এই স্থানে সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করিতেছি যে, শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীই আমায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বিশেষরূপে প্রণোদিত এবং উৎসাহিত করিয়া, আরম্ভ হইতে নানা প্রকারে আমায় সাহায্য করিয়াছেন। এই গ্রন্থ-সন্নিবিষ্ট তেইশ খানি ব্লকও, তিনিই আমায় দান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার উৎসাহ ভিন্ন এ পুস্তকখানি কখনই রচিত হইতে পারিত না।

"মানসী ও মর্ম্মবাণী"র সহৃদয় কর্ত্তৃপক্ষগণ এবারেও আমায় কতকগুলি ব্লক দিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের নিকট আমি ঋণী। বাকীগুলি নূতন তৈরি করান' হইয়াছে।

ফটোগ্রাফের অভাবে দু'একখানি প্রয়োজনীয় চিত্র এবার দিতে পারা গেল না; দ্বিতীয় সংস্করণে সে ত্রুটি সংশোধিত করিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি সন ১৩২৬ সাল, ২১শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার দোলপূর্ণিমা,—(ইংরাজী ৪ঠা মার্চ্চ, ১৯২০)

১৪এ, রামতনু বসুর লেন,
কলিকাতা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সূচী

চিত্র-সূচী



শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (বর্ত্তমান বয়সে)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

সূচনা

ইংরাজি ১৯১২ সাল ১লা এপ্রিল, সম্রাটের আদেশে বঙ্গ ও বেহার প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হইল। আমি স্থানান্তরে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম;—এপ্রিলের শেষভাগে বদলি হইয়া রাঁচিতে পৌঁছিলাম। সাহিত্য-রথী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রাঁচিতে স্থায়িভাবে অবস্থান করেন ইহা আমার পূর্ব্বাবধিই জানা ছিল। কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ তৎপূর্ব্বে আমার ঘটে নাই—সুতরাং রাঁচিতে পৌঁছিয়াই সেই সৌভাগ্যলাভের ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল।

রাঁচি, ২৯শে এপ্রিল, সোমবার। সন্ধ্যা ৬টার সময় জনৈক বন্ধুর সঙ্গে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ-মানসে বাহির হইয়া প্রায় ৬॥০টার সময় তাঁহার নব-নির্ম্মিত "শান্তিধামে" গিয়া উপস্থিত হইলাম। "মোরাবাদী" নামক একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর তাঁহার বাসভবন। পাহাড়ের উপরে একটি কোঠা-বাড়ী ও তাহার

সানুদেশে তিনটি বাঙ্গলা। সেদিন রাত্রিটি বড় পরিষ্কার ছিল। মাথার উপর আকাশভরা জমাট জ্যোৎস্না, পায়ের তলে সবুজ ঘাস; পথের পাশে-পাশে অগণিত পার্ব্বত্যবৃক্ষগুল্মের উপবন; আর দূরে, প্রকৃতির চন্দ্রালোকিত সেই নৈশবাসর-কক্ষে চিত্রিত প্রাচীরের মত তরঙ্গায়িত কালো কালো পাহাড়ের শ্রেণী—একটানা, অচ্ছিন্ন, যেন অঙ্কিত। পাহাড়তলীর মেঠো পথে কোল মজুরেরা গান করিতে করিতে বাড়ী ফিরিতেছে। এ নির্জ্জন পার্ব্বত্যপথে ইহাদের কোলাহলেই প্রভাতের আলো ফুটে, আবার ইহাদের কোলাহলেই দিনের আলো শেষ হয়। এই কোল-নরনারীর সম্মিলিত-সঙ্গীতেই প্রতিদিন এখানে নিসর্গমঞ্চে আলো-আঁধারের পটপরিবর্ত্তন হয়।

বাণী ও কমলার বরপুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সে সময়ে নীচের ঘরের বারান্দায় বসিয়া আত্মীয়স্বজনের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলেন। বন্ধুবর একটু দূরে দাঁড়াইলেন, আমি একটু অগ্রসর হইয়া একজন ভৃত্যকে বলিলাম, "বাবুকে বল, আমরা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

জ্যোতিবাবু যেখানে ছিলেন ভৃত্য আমাদিগকে একবারে সেই স্থানেই লইয়া যাইতে চাহিল; কিন্তু আমরা তাহাতে স্বীকৃত না হইলে সে বলিল, "তবে হামি বাবুকে বলিয়া দিচ্ছি, আপ্ লোগ্ ঠার্ করুন্।"

ভৃত্য যেমন সংবাদ দিল, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়াই জ্যোতিবাবু একেবারে আমাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত। দেখিলাম দীর্ঘ, ঋজু, কৃশ, গৌরবর্ণ একটি মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে। সে মূর্ত্তি প্রসন্ন, হাস্যোজ্জ্বল, কোমল। তাঁহার কণ্ঠস্বর মৃদু অথচ স্নেহভরা। ললাট প্রশস্ত, নাসা উন্নত, মুখশ্রী সৌম্য, সরল এবং প্রতিভাদীপ্ত। সেই অস্পষ্ট স্নিগ্ধ



"শান্তিধাম"

জ্যোৎস্নালোকে শুভ্র পায়জামা ও পাঞ্জাবী পরিহিত, অতোধিক স্নিগ্ধ ও কান্তবর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া, স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের আবির্ভাব মনে করিয়া আমরা দুইজনেই কিছুক্ষণ বাক্য হারাইয়া বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম ; সম্ভ্রমে অপ্রতিভভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমরা তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিলে, তিনি আমাদিগকে নীচেই একটি কক্ষে লইয়া গিয়া বসাইলেন। সে কি সৌজন্য,কি স্নেহ ! সে সময় বহুদিন এমন স্নেহের কথা শুনি নাই বলিয়াই তাঁহার স্নেহ যেন আমরা দ্বিগুণ পরিমাণে অনুভব ও উপভোগ করিলাম। আমাদের কথাবার্ত্তায় সেখানে বিঘ্ন ঘটিতে পারে ভাবিয়া তিনি আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া আঁকা বাঁকা পথে পাহাড়ের উপরের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। এই উপরের বাড়ীতেই তিনি আজকাল থাকেন, নীচে কখন কখনও কোনও কাযে বা ভ্রমণের সময় নামিয়া আসেন। উপরে উঠিতে উঠিতে আমাদিগকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে আপনারা রবি ভাবেন নি ত ?"

আমরা সেরূপ ভুল করি নাই, জানাইলাম। তার পর তিনি আমাদের পরিচয় শুনিয়া, একটু চিন্তা করিয়াই বলিলেন, "হাঁ, হাঁ আপনার নাম যে আমি জানি, মধ্যে মধ্যে আপনার লেখা পড়ে' থাকি।" এই বলিয়া, তিনি আমার একটি কবিতার খুব প্রশংসা করিলেন।

উপরে গিয়াই তিনি আমাদিগকে তাঁহার উদ্যানবাটিকায় লইয়া গেলেন। সেখানে ছোট ছোট পুষ্পতরুগুলির তলদেশে সমাকার শ্বেত উপলখণ্ডগুলি আলিপনার ন্যায় সজ্জিত ; লতাগুলি উদ্যানমধ্যে, প্রাচীরগাত্রে, বৃক্ষকাণ্ডে সংলগ্ন,—নানাবিধ পুষ্পলতার বিচিত্র গন্ধে বর্ণে পুষ্পবাটিকাটি তপোবনের মত সুন্দর, পবিত্র এবং মনোরম। তিনি বলিলেন, কয়েকদিন হইল, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের মহামান্য

ছোটলাট বাহাদুর (Sir Charles Bayley) সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইয়া তাঁহার বাসভবনে আসিয়া উপস্থিত হন। জ্যোতিবাবু তখন নীচে ছিলেন। তিনি জানিতেনও না যে লাটসাহেব তাঁহার বাটীতে আসিয়াছেন। লাট বাহাদুর পুষ্পবাটিকাটি দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হয়েন, এবং জ্যোতিবাবুর জনৈক অতিথি অবিনাশ বাবু, যিনি লাটবাহাদুরকে এই সমস্ত দেখাইতেছিলেন, তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "I envy you Babu."

পাহাড়টির সর্ব্বোচ্চশৃঙ্গে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত উপাসনামন্দির আছে। মন্দিরটি সহরের প্রায় সমস্ত স্থান হইতেই দৃষ্টিগোচর হয়। এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিতে অনেক অর্থও ব্যয় হইয়াছে। মন্দিরটি ছোট; কেবল চারিদিকে চারিটি স্তম্ভ ও মাথায় একটি ছাতার মত ছাদ। লম্বে প্রস্থে মন্দিরটি ১২।১৪ ফুটের বেশী নয়। এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে জ্যোতিবাবু কাশী হইতে মিস্ত্রী ও প্রস্তর আনাইয়াছিলেন—এবং নীচে হইতে উপরে পাথর উঠাইতেও ২।৩ মাস কাল বৃথা ব্যয় হয়। মিস্ত্রীরাও বসিয়া বসিয়া ২।৩ মাস বেতন লইয়াছিল,—ইত্যাদি নানা অসুবিধায় ন্যায্য যাহা ব্যয়িত হওয়া উচিত ছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশীই পড়িয়া গিয়াছিল। প্রথম প্রথম এখানে তাঁহাকে বড়ই জলকষ্টে ভুগিতে হইয়াছিল। কিয়দ্দূরে একটি ঝরণা ছিল, তাহা হইতে জল আনাইয়া কোনও রকমে মিস্ত্রীর কায এবং নিজেদেরও ব্যবহার চলিত।

অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া আমরা পাহাড়টির উষ্ণীষের মত এই মন্দিরটির মেঝেতে আসিয়া বসিয়া নানা বিষয়ের কথোপকথন করিতে লাগিলাম।

বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "আগের চেয়ে বাঙ্গলা



উপাসনা মন্দির

সাহিত্য এখন অনেক উন্নত। এখন্ লোকে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা গবেষণামূলক সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত। এ বড়ই শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নাই। এখন লেখকেরা নূতন নূতন স্থানের বিবরণ দিয়া নানা স্থানের কাহিনী, উপকথা, আচারব্যবহারের ইতিহাস দিয়াও বঙ্গসাহিত্যকে দিন দিন সমৃদ্ধ করিতেছেন।"

নূতন লেখকদিগের সম্বন্ধে তিনি বলেন, "উদীয়মান কবিদিগের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একজন প্রতিভাবান কবি। যতীন্দ্রমোহন বাগ্চীর কবিতাও আমার ভাল লাগে। গল্পলেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, এঁদের লেখা আমার বড় ভাল লাগে।" গল্পলেখার সম্বন্ধে তিনি বলেন, "গল্পলেখা অবজ্ঞার জিনিস নহে—এতেও খুব গুণপনা আবশ্যক। গল্পের Plot রচনা করিতে ও চরিত্রাদি বর্ণনা করিতে যথেষ্ট কল্পনাশক্তি ও সূক্ষ্মদৃষ্টি আবশ্যক, তারপর মানবচরিত্রে অধিকার না থাকিলে গল্প মোটেই জমে না; এ হিসাবে গল্প ও উপন্যাসের মূল্য অল্প নহে।"

নিজের লেখা সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "আর যৌবনের সে তেজ ও ক্ষমতা নাই, এখন কোনও রকমে অভ্যাসটা রক্ষা করা—এ একটা ব্যাধির মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই, "প্রবাসী," "ভারতী," "বঙ্গদর্শনে" একটু একটু লিখিয়া থাকি। লিখিতে ইচ্ছা খুবই, কিন্তু সামর্থ্যে কুলায় না।"

ভাষার আলোচনায় তিনি বলিলেন, "আজ কাল দু'টো নূতন কথা উঠেছে "কী" আর "মতো"। অনর্থক শব্দ বিকৃতিতে লাভ কি? অধিকাংশ স্থলেই অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায়—দুই এক স্থলে অর্থের অস্পষ্টতা হতে পারে, আমি স্বীকার করি। যেখানে অস্পষ্টতার সম্ভাবনা আছে সেখানে শব্দটা বিকৃত না করে, একটা হাইফেন—চিহ্ন বসালেই তোসব

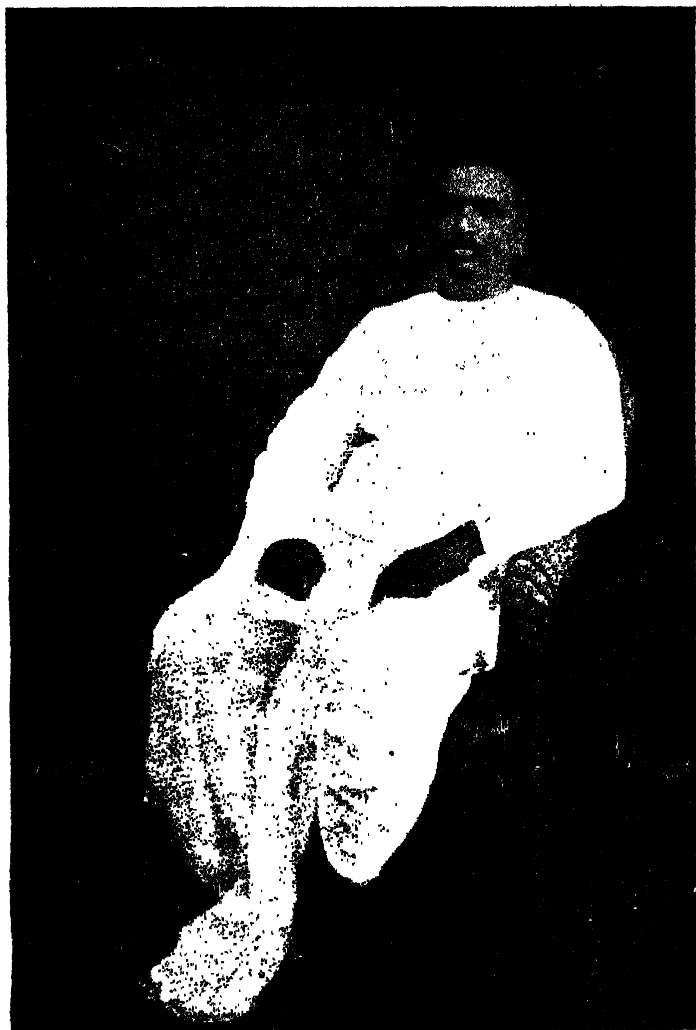
গোল মিটে যায়। 'যেমন মনে কর—"তুমি কি বল্‌চ ?" এই বাক্যে ঝোঁকের বা অর্থের ভিন্নতা অনুসারে "তুমি কি বল্‌চ ?" বা "তুমি কি-বল্‌চ ?"—এইরূপ লেখা যাইতে পারে। প্রথম স্থলে, "তুমির" উপর ঝোঁক, দ্বিতীয় স্থলে "কি-র" উপর ঝোঁক।

"মত" শব্দের অর্থ যেখানে "সদৃশ"—সেখানেও আবশ্যক হইলে এইরূপ হাইফেন প্রয়োগে অর্থ স্পষ্ট করা যাইতে পারে। যথা "তোমার-মত লোক নাই !"

"যাই হোক্, কোন বিশেষ চিহ্নপ্রয়োগে যদি ভাষার অস্পষ্টতা দূর হয়, তবে তাহাই করা কর্ত্তব্য।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিলেন যে, আরবী ও ফারশী ভাষাও এই হিসাবে অসম্পূর্ণ। কেন না, তাহাতে এক বানানের অনেকরূপ পাঠ হয়, কাযেই অর্থ না বুঝিয়া পড়া যায় না। এ সমস্ত যে ভাষার অভাব তাহাতে আর সন্দেহ নাই। "আমাদের ভাষায় V উচ্চারণের মত বর্ণ নাই, এইজন্য আমি V লিখতে "ভ" না লিখে মারাঠী নিয়মে "হ্ব" লিখি।" দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিলেন, "আহ্বানে" "হ্ব" অনেকটা Vর মত, এই জন্য Venus লিখিতে তিনি "ভিনাস না লিখিয়া "হ্বিনাস" লেখেন।

যোগেশবাবুর যুক্তাক্ষরনির্ব্বাসনসজ্জা দেখিয়া তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "এ কেবল শক্তির অপব্যবহার ও পণ্ডশ্রম মাত্র। তাঁহার প্রণালী সাধারণে গৃহীত হইবার পক্ষে কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না।"

তাহার পর আমাদিগকে লইয়া তিনি ছাদের উপর গিয়া বিজয় বাবুর (মজুমদার) কথা পাড়িলেন। বিজয় বাবুর অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "বিজয় বাবুর চমৎকার ছন্দজ্ঞান। তিনি যে একজন গ্রন্থকীট তাহা তাঁহার লেখা পড়িলেই বুঝা যায়।" বিজয়বাবুর বিষয়



শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

তিনি আমায় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে তাঁহার চক্ষুর অসুখ শুনিয়া খুবই বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন।

হঠাৎ অর্শপীড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের ইয়ুরোপযাত্রা স্থগিত হইয়া গেল, সে অসুখ এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই, ডাক্তারেরা এখন তাঁহাকে অন্তত ৩।৪ মাসকাল সামান্য নড়াচড়া পর্য্যন্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এই কথা কয়টি বলিতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোমল হৃদয় ভ্রাতৃবাৎসল্যে ভরিয়া উঠিল এবং কণ্ঠস্বর ক্ষীণতর হইয়া গেল।

রাত্রি প্রায় ৮৷৷৹ বা ৯টা বাজিল। আমরা সেদিনের মত বিদায় ভিক্ষা করায় জ্যোতিবাবু দুঃখ-প্রকাশ করিলেন যে রাত্রি অধিক হওয়ায়, তাঁহার একটি লতামণ্ডপ ও একটি গুহা আছে সে দুইটি আমাদিগকে দেখাইতে পারিলেন না। এই জন্য আর একদিন একটু সকাল সকাল আসিতে অনুরোধ করিলেন।

আগামী রবিবারে জ্যোতিবাবুকে "বাল্মীকি-প্রতিভা"র সুর শুনাইতে অনেকে অনুরোধ করিয়াছেন,তিনিও স্বীকৃত হইয়াছেন—এই জন্য তাঁহার গৃহে সেইদিন একটি মজলিশ হইবে। তিনি আমাদিগকেও তাহাতে হাজির হইবার জন্য সস্নেহে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং সেদিন যে নিশ্চয়ই আসিব সে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া তবে আমাদিগকে ছাড়িলেন।

জ্যোতিবাবুর কাছেই শুনিলাম যে "বাল্মীকি-প্রতিভা"র প্রায় সব গানের সুরই জ্যোতিবাবুর সংযোজিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আমাদিগকে নীচে পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায় দিয়া গেলেন। আমরা পথে ভাবিলাম—"আজ সোমবার, রবিবার আসিতে এখনও অনেক দেরী!"

(২)

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এ ভবনের নাম "শান্তিধাম"। শান্তিধাম বাস্তবিকই শান্তিধাম। এখানে আরও একটি বিশেষ জিনিষ এই যে, ফটকের উপরে ধ্যানীবুদ্ধের একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।

শান্তিধামের আর একটি বিষয় বাকী রহিয়া গিয়াছে। প্রথম, একটি গুহা। গুহাটি কৃত্রিম নয়। যে পাহাড়ের উপরে জ্যোতিবাবুর বাড়ী, তাহারই পশ্চিম দিকে কয়েকটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর এমন ভাবে আছে, যে তাহা দ্বারা আপনা-আপনিই নীচে একটি ভীষণ গহ্বর সৃষ্ট হইয়াছে। গুহার ভিতরে স্থান নিতান্ত কম নয়। সাত-আট জন লোক অনায়াসে সেখানে বসিয়া শুইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে আলাপ করিতে পারে। সম্প্রতি তাহার ভিতরটি বাঁধাইয়া আরও আরামপ্রদ করা হইয়াছে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অন্ধকারও নয়। উপরে নীচে পাশে চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো কালো পাথর। গুহার ভিতরে বসিলে মনে হয় যেন গিরিপ্রস্তরময়ী ধরণীর কোলে বসিয়াছি। তার পাথরগুলির গায়ে ঠেস দিলে বা স্পর্শ করিলে মনে হয় মূর্ত্তিমতী পৃথিবীকেই যেন স্পর্শ করিতেছি। গুহাটির প্রায় ২০০ ফুট নীচে সমতল ক্ষেত্র।

দ্বিতীয়, একটি লতামণ্ডপ। ঠিক এই গুহার নীচে, পাহাড়টির গায়েই এই মণ্ডপটি যেন আঁকা। মণ্ডপটি সমতল ক্ষেত্রভূমি হইতে একটু উচ্চে অবস্থিত। মণ্ডপের তলাটি বেশ শান্‌-বাঁধান'—"বেঞ্চি"-গাঁথা। উপরের ছাদে একটি মঞ্চ রচিত হইয়াছে, তাহাতেই লতা-গাছটিকে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এখন সেই লতা-জালে মঞ্চটি একেবারে আচ্ছন্ন।



"বাল্মীকি-প্রতিভা"য় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ
সুর-সংযোগ করিতেছেন।

মধ্যে মধ্যে জ্যোতিবাবুর এই নির্জ্জন শৈলাবাসে সত্যেন্দ্রনাথও আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তাঁহার সঙ্গীর মধ্যে দুইটি জীব। এক "গঞ্জু" কুকুর, অপর "রূপী" বানরী। রূপীকে আগে দেখি নাই, এইবার দেখিলাম। তাহার হৃদয় মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ। রূপীর কোলে একটি ছোট কুকুরের বাচ্ছা। একদণ্ডও সে বাচ্ছাটিকে ছাড়িয়া দেয় না। বাচ্ছাটি মাতৃহীন, রূপীও বন্ধ্যা। কুকুর-বাচ্ছাটি রূপীর স্তনপান করে, এবং দিন-রাত্রি তাহার নিকটেই থাকে। কেহ বাচ্ছাটিকে লইতে গেলে রূপী একবারে সিংহীর মত তাহাকে আক্রমণ করিতে আসে। বাচ্ছাটি রূপীর বক্ষঃস্থল আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে, তবুও সে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া রাখে। রূপী যখন খায়, তখনও বাচ্ছাটিকে এক হাতে ধরিয়া থাকে, পাছে সে পলাইয়া যায়। এই বাচ্ছাটি আজ কয়েক দিন হইল কোথায় চলিয়া গিয়াছে, রূপী দিন দুই প্রায় অভুক্ত ছিল। কেহ যদি "আয় আয়" বলিয়া চুম্‌কারি দিত, অমনি সে তড়িতাহতের ন্যায় উচ্চকিত হইয়া ব্যাকুল নেত্রে চারিদিক খুঁজিত, ভাবিত বুঝি সে ফিরিয়াছে। হায়রে মাতৃস্নেহ! আগে জানিতাম কুকুরে ও বানরে কখনই বনে না। কিন্তু মাতৃস্নেহের নিকট আজ সে জাতিগত পার্থক্য কোথায়? শান্তিধামে সবই শান্ত, সবই পবিত্র!

শান্তিধামের দর্শকসংখ্যাও বড় কম নয়! প্রত্যহ সকাল ৭টা হইতে বেলা ১০টা ও অপরাহ্নে ৪টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দর্শকের বিষম ভিড়। সকলের জন্যই দ্বার অবারিত। বাড়ী ঘর সারাদিনই খোলা পড়িয়া আছে, ফটকও দিবারাত্র অরুদ্ধ, যে-কেহ আসিয়া সব পরিদর্শন করিয়া যাইতে পারে, কাহাকেও কাহারও অনুমতির অপেক্ষা করিতে হয় না। কিন্তু সাহেবেরা যখন দেখিতে আসেন, তখন নীচে হইতে

আগে অনুমতি লইয়া তবে উপরে উঠেন। যদিও এরূপ অনুমতির কোন প্রয়োজন নাই তাঁহারাও জানেন—তথাপি একটা ভদ্রতা বা সভ্যতাসূচক কায়দার জন্য তাঁহারা বিনা অনুমতিতে কখনও উপরে আসেন না।

৫ই মে, ১৯১২, রবিবার। নিমন্ত্রণরক্ষা-কল্পে পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর সহিত ঠিক ৬৷৷৹টার সময় "শান্তিধামে" আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নীচে হইতে পাহাড়ের উপরের ঘর পর্য্যন্ত পথটি দীপমালায় আলোকিত। ফটকে তিন চারিজন দারোয়ান্ ছিল—তাহাদেরই একজন আমাদিগকে উপরে লইয়া গেল। উপরে যাইবামাত্রই জ্যোতিবাবু সস্নেহে আমাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। নিজে যেমন মিষ্টমুখে আমাদিগকে আহ্বান করিলেন, তেমনি আমাদিগকেও বেশ বস্তুতান্ত্রিকভাবে মিষ্টমুখ করাইয়া দিলেন। সেদিন সহরের গণ্যমান্য ভদ্রলোক প্রায় সকলেই তাঁহার বাটীতে উপস্থিত ছিলেন।

ঠিক সাড়ে সাতটার সময় "বাল্মীকি-প্রতিভা" আরম্ভ হইল। প্রথমত "বাল্মীকি-প্রতিভা"র সারাংশটি তিনি মিষ্টমধুর ভাষায় বিবৃত করিয়া, যেখানে যেরূপ হাবভাব প্রয়োজন ঠিক তেমনি করিয়া একে একে সমস্ত গানগুলি গাহিয়া গেলেন। গান অপেক্ষা এখনও আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া আছে সেই "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠা ত্বম্" শ্লোকটি! সে যে কি গভীর ভাবাবেশে ও গম্ভীর স্বরে শ্লোকটি তিনি আওড়াইয়াছিলেন সে যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। সেই স্বর যেন এখনও কানে বাজিতেছে। গৌরকান্তি, শুভ্রকেশ, তপস্বীর মত—উজ্জ্বল দীর্ঘ ক্ষীণ দেহযষ্টি উত্তোলন করিয়া যখন তিনি শ্লোক পাঠ আরম্ভ করিলেন, তখন মনে হইল যেন সত্য-সত্যই বাল্মীকির মুখে সেই আদি-কবিতা শুনিতেছি। "বাল্মীকি-প্রতিভা"র পর সকলের অনুরোধে অন্য বিষয়ক গীতবাদ্যাদিও আরম্ভ হইল।

আমাদের সম্মুখেই Dwarkinএর একটি বিশাল piano ছিল—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিপুণ অঙ্গুলিস্পর্শে সে বিপুল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। পিয়ানো, সেতার, তবলা, মন্দিরা, এসরাজ, হার্ম্মোনিয়ম প্রভৃতির সহযোগে কয়েকটি ঐক্যতান বাদ্য হইল,—এবং আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কেবল একজন ভদ্রলোক গান করিলেন। রাত্রি ১০টার সময় সভা ভঙ্গ হইল—আমরাও হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া বাসার দিকে ফিরিলাম।

এ আসরে দেখিবার একটি বিশেষ জিনিষ ছিল, সেটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধ্যবসায় এবং ললিতকলার প্রতি অক্লান্ত অনুরাগ। এক মুহূর্ত্তও না থামিয়া "বাল্মীকি-প্রতিভা"র সমস্ত গানগুলি একে একে গাহিতে তাঁহার শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তবু তাঁহার উৎসাহের বিন্দুমাত্রও হ্রাস দেখা গেল না। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে যখন বেহালা ও পিয়ানো বাজাইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ক্লান্তি দেখিয়া আমাদের কষ্ট হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি প্রকৃতিজয়ী একনিষ্ঠ সাধকের মত একবারে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। বার্দ্ধক্য ও ক্লান্তি পরাজিত হইয়া দূরে সরিয়া গেল, আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আপনার মহামহিমায় প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। আসিবার সময় তাঁহার কষ্ট হইল বলিয়া আমরা ক্ষমাভিক্ষা করায় জনৈক ভদ্রলোক বলিলেন, "আমাদের ত আমোদ হ'ল!"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হাসিলেন, কিন্তু কথাটা ঠিক। সে হাসিটি শিশুর মত উচ্চ ও সরল।

(৩)

রাঁচিতে আমি প্রায় একবৎসর ছিলাম। এই অল্পকালের মধ্যেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুত্রাধিক স্নেহ ও অপরিসীম আদরলাভের পরম সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। আমায় চাকরী উপলক্ষে সহরের মধ্যেই থাকিতে হইত, কিন্তু প্রত্যহ একবার করিয়া আমার মোরাবাদী না গেলেই চলিত না। যদি কোনও দিন বিলম্ব হইত, জ্যোতিবাবু লোক পাঠাইয়া দিতেন। যদি কোনও কারণে কোনও দিন যাওয়া না ঘটিত, তাহা হইলে পরদিন প্রাত-র্ভ্রমণে বাহির হইয়া তিনি স্বয়ং রিক্স চড়িয়া আসিয়া আমায় তিরস্কার করিয়া যাইতেন। তাঁহার আদরের চেয়ে তাঁহার সেই তিরস্কারেই আমি অধিক পুলকিত ও গভীর আনন্দের বেদনায় আত্মহারা হইয়া, তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িতাম।

৪ঠা আগষ্ট রবিবার ১৯১২—পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং আমি কথোপকথন করিতেছি। প্রসঙ্গক্রমে জ্যোতিবাবু বলিলেন যে “আজকালকার স্কূলের পড়ান’তে আমার মোটেই আস্থা নাই। যে-রকমে ছেলেদিগকে পড়ান’ হয় এ যেন অনেকটা বেগার-ঠেলা না-করিলে-নয় এই ভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে। ছেলেদের কি পড়িতে ইচ্ছা, কিসে অনিচ্ছা, কোন্‌টা তাহারা শীঘ্র শিখিবে, কোন্‌টা তাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ—তার কোন’ বিচারই করা হয় না। পরীক্ষা হয় সে শুধু বানান্‌ ও মানে মুখস্থর, এবং ধারাপাতের আবৃত্তির। ছেলের যে কি ক্ষমতা বা কোন্‌ বিষয়টি কোন্‌ ছেলে শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পারিবে—এই অত্যন্ত দরকারী বিষয়টাকে একবারে উপেক্ষা করা হয়। ছেলেদের জন্য যে একটা Rcutine করে দেওয়া আছে, চোখ বুজে সেই রুটিনেরই তারা অনুসরণ করে।

"আমার মতে প্রাথমিক শিক্ষা রামায়ণ মহাভারতে যতটা হয়, এমন বোধ হয় আর কিছুতেই হয় না। আজকাল শিশুপাঠ্য নামে অনেক পুস্তকই প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু সেগুলি বাস্তবিক শিশুর উপযোগী কি না, একটা চিন্তার বিষয়। শিশুর নমনীয় হৃদয়খানিকে ভাবের, ধর্ম্মের, কল্পনার, জ্ঞানলিপ্সার, ধারণার উপযোগী বিষয় সে সব পুস্তকে একত্র আছে কিনা সন্দেহ। এই হিসাবে, শিশুদের উপযোগী করিয়া রচিত রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক ধর্ম্মগ্রন্থগুলি অমূল্য।"

পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথও এই কথা স্বীকার করিয়া জ্যোতিবাবুর প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-প্রণালীর অনুমোদন করিলেন।

জ্যোতিবাবু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একটি পুত্র ও একটি কন্যার শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন, আমি গতবার দেখিয়া গিয়াছিলাম। শিক্ষাপ্রণালীটি একটু অদ্ভুত প্রকারের বলিয়া তাহার পরিচয়ও একটু এই প্রসঙ্গে দিব।

শিশু দুইটি গান শেখে, পিয়ানো শেখে, সর্ব্বদা "দাদাভাই"এর সহিত গল্প করে—আবার পড়ে এবং অঙ্ক কষে। দুইজনের বয়সই আট বৎসরের ভিতর।

জ্যোতিবাবু সুবীরেন্দ্র ও মঞ্জুর জন্য দুইখানি খাতা বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাতে ছেলেদের মত কয়েকটি কবিতা ও গান আছে। প্রথমত সেই কবিতা মুখস্থ করিয়া গান করিতে হয়, তারপর সেইটি পিয়ানোতে বাজাইতে হয়—তাহারও স্বরলিপি আছে। আবার যেটি যেমন কবিতা, তাহার পাশে তদনুরূপ একটি চিত্রও আছে। একাধারে ভাব, ছন্দ ও রূপশিক্ষার প্রণালী আমার এই নূতন দেখা। চিত্রগুলি কোনটি কালিতে, কোনটি পেন্সিলে, কোনটি বা দুই তিন রঙের কালিতে।

বলা বাহুল্য, এগুলি সবই জ্যোতিবাবুরই হাতের আঁকা। শিশুদের জন্য বলিয়া সেগুলিতে চিত্রসম্পদের অভাব কিন্তু কিছুই নাই।

এইরূপ অধ্যাপনার কিরূপ সুফল ফলিয়াছে, তাহারও একটু পরিচয় দিতেছি :—

জ্যোতিবাবু বলিলেন "সেই 'দেশ দেশ' গানটা গাও ত ?" অমনি সুবীর ও মঞ্জু দুই ভাই-বোনে গাহিতে লাগিল :—

মিশ্র ঝিঁঝিট।

দেশ দেশ ভাই আমাদের দেশ
সকল দেশের আগে সে কোন্ দেশ,
ভাই, আমাদের দেশ ॥
উত্তরেতে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর
পূবে দক্ষিণে ভাই পাহাড় মনোহর
—ভাই, পাহাড় মনোহর—
তার মধ্যে মায়ের আঁচল, সোনা-ঢালা বেশ,
গাছ-গাছালি, ক্ষীরের নদী, সোনা ধানের ক্ষেত
—ভাই, আমাদের দেশ ॥
ঝিকিমিকি সূর্য্যি উঠে, রেতে ফুটে তারা,
চাঁদের জ্যোছনা ভাই যেন ফটিক ধারা
—ভাই, যেন ফটিক ধারা।
এমন দেশ ভাই আছে কোথায়, এমন সোনার দেশ,
মায়ের কোলে দেশের ছেলে আমরা আছি বেশ—
—ভাই, আমাদের দেশ ॥

সুবীর অতি নিপুণভাবে পিয়ানো বাজাইয়া গাহিতে লাগিল, ছোট্ট

বোন মঞ্জু, দাদাটির পাশে দাঁড়াইয়া অতি চমৎকার কোরাসে গাহিল। এই গানটির পাশেই ভারতবর্ষের মানচিত্র। এই এক গানেই ছেলেদের মনে স্বদেশের রূপ ও স্বদেশের প্রতি ভক্তি যে কিরূপ পরিস্ফুট হয়, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়।

ইহার পর জ্যোতিবাবু বলিলেন, "সেই থিয়েটারটা কর' ত?" অমনি একটা ত্রিপদ টেবিলের নীচে মঞ্জু বুড়ী হইয়া বসিল, আর জ্যোতিবাবু পিয়ানোতে বসিলেন, সুবীর হাত ছানিয়া তপন আহ্বান করিতে করিতে গাহিতে লাগিল :—

"আয় রদ্দুর ছে—নে, ছাগল দিব মে—নে,
ছাগ্‌লির মা' পাগ্‌লি, ক'থান্ কাপড় পে—লি?"

মঞ্জু গাইল,—

"ছ'থান কাপড় পেলুম্, ছ' বৌকে দিলুম্ (ছয়টি পুতুল ছয়টি বৌ) (কাঁপিতে কাঁপিতে) আপনি মরি জাড়ে, কলাগাছের আড়ে।"

সুবীর গাইল,

"কলা পড়ে টুপ্‌ টাপ্‌, বুড়ী খায় গুপ্‌ গাপ্‌।"

তার পর, দুইজনেই হাসিয়া গড়াগড়ি!

খাতাতেও এমনি একটি ছবি আছে। বুড়ী কলাগাছের নীচে উপবিষ্ট। কলা পড়িতেছে, পাশে ছয়টি বৌ দাঁড়াইয়া আছে, অদূরে একটি বালক হাত ছানিয়া রৌদ্রআহ্বান করিতেছে।

এইরূপ প্রায় ২০।২৫টি কবিতা পড়া হইয়া গিয়াছে। জ্যোতিবাবু নিজে আবাল্য সঙ্গীতানুরাগী, এইজন্য সঙ্গীতকেও তিনি শিশুদের শিক্ষার পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া দিয়া কৌশলে, হাসি-তামাশা গান-নাচের মধ্য দিয়া অধ্যাপনার প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। জ্যোতিবাবুর

ছাত্রেরাও এই অল্পদিনের মধ্যে এবং এই অল্প বয়সে এত শিখিয়াছে যে তাহা ভাবিলে যুগপৎ স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইয়া যাইতে হয়।

বেশ বুঝা গেল, শিক্ষাশালায় শুধু বেত ও নীরস বানান মুখস্থের স্থান একটুও নাই। এই অপূর্ব্ব শিক্ষাপ্রণালী যিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, স্বতই তাঁহার চরণতলে মাথা নত হইয়া পড়ে।

একদিন আমি তাঁহাকে বলিলাম—"আপনার মুখে এত মজার কথা, এত রসের কথা শুনি যে আমার ইচ্ছা হয়, আপনার জীবন-বৃত্তান্তটি আপনার মুখের কথায় লিপিবদ্ধ করি।"

এতদিন তিনি কোনও কিছু আশঙ্কা বা আমাকে'ও বিভীষণ সন্দেহ করেন নাই! কিন্তু যেমন আমি আমার ইচ্ছা ব্যক্ত করিলাম, অমনি তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

নানাপ্রকার যুক্তি-কারণ-প্রদর্শন করিয়া আমায় এই কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু ভবী ভুলিল না। তিনি নিজে যে অধিকার আমায় দিয়াছিলেন, সেই অধিকারের দাবীতেই আমি তাঁহার উপর জুলুম জবরদস্তি আরম্ভ করিয়া দিলাম।

শেষে তিনি হতাশ্বাসে বলিলেন—"দেখ বসন্ত, তোমাকে ত পারবার জো নেই! তুমি যখন ধরেছ—তখন ছাড়্‌বে না। কিন্তু তুমি যে শেষে বিশ্বাসঘাতকতা করে এই বুড়োকে জনসমাজে টেনে বের করবে—তোমায় আমি একদিনও সে সন্দেহ করি নাই!" ইত্যাদি।

তিনি জীবনে এমন কোন কার্য্যই করেন নাই, যাহাকে সাহিত্যের উদ্যানে অক্ষরের বেড়া দিয়া রাখা যাইতে পারে প্রভৃতি নানারূপ ওজর আপত্তি আবার করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ওজরই যখন টিকিল না—তখন তিনি হতাশ্বাসে বলিলেন,"ওহে তোমায় দেখে এখন আমার বড় ভয় লাগ্‌চে! আমি তাই ভাব্‌চি—তুমি এমন ভয়ঙ্কর কি করে হয়ে উঠ্‌লে?"

বাল্য-স্মৃতি

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম পুত্র। ইঁহাদের বাড়ীতে সে সময়ে একজন গুরুমহাশয় ছিলেন, তাঁহার নিকটেই ইঁহার হাতে-খড়ি হয়। বাড়ীর দুই-চারিজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের অন্যান্য কতকগুলি ছেলে লইয়া গুরুমহাশয় ঠাকুর-দালানে একটি পাঠশালা খুলিয়াছিলেন। গুরুমহাশয়টি একবারে সেকেলে পণ্ডিতের জ্বলন্ত আদর্শ। রং কালো, গোঁপ-যোড়া কাঁচাপাকায় মিশ্রিত মুড়া-খ্যাংরার ন্যায়। চুল লম্বা, উড়েদের মত পিছন দিকে গ্রন্থিবদ্ধ।

একটা কালিপড়া মাদুরের উপর পাঠশালার ছেলেরা বসিত। পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে কখনও এতটুকু হাসি দেখা যাইত না; যদি বা কখনও ওষ্ঠপ্রান্তে একটু-আধটু হাসির বক্ররেখা দেখা দিত ত' সে বর্ষণোন্মুখ শ্রাবণমেঘে বিজুরীলেখার মত ছাত্রদিগকে বেত মারিবার সময় সেটুকু ফুটিত। বোধ হয় সে শুধু হাতের সুখ অনুভব করিয়া পড়াইবার সময় গুরুমহাশয় অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় পা ছড়াইয়া বসিয়া "গুরুচ্ছাদি" তৈলমর্দ্দন করিতেন। সে তৈলের কি-এক বিট্‌কেল গন্ধ! তাঁহার এক গাছি ছোট বেত ছিল, নিজের দেহের সঙ্গে সঙ্গে সেটিকেও তিনি সযত্নে তৈল মাখাইতেন। নিয়মিত তৈলমর্দ্দনে বেত গাছটিতেও বেশ একটা পাকা রং ধরিয়াছিল। এই বেত্রটির উপর গুরুমহাশয়ের পুত্র-বাৎসল্য ছিল। একবার ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দুষ্টামি করিয়া এই বেতখানিকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে গুরুমহাশয় ঠিক যেন বৎসহারা গাভীর মত শোকে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরে অনেক খোসামুদি, সাধ্যসাধনা করিয়া বেতটি তাঁহার নিকট হইতে

ফিরিয়া পাইয়া, তবে তিনি প্রকৃতিস্থ হন। অপরাধে, বিনা-অপরাধে, যখন-তখন, এই বেতগাছটি ছাত্রদিগের পৃষ্ঠসংস্পর্শে আসিত। আশ্চর্য্য এমনি তাঁহার হস্তকণ্ডূয়ন যে, যখন ছুটি দিতেন তখনও দুই চারি ঘা পটাপট্ বেত্রাঘাত না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না, আর সেই সঙ্গে কতকগুলা অকথ্য গালিবর্ষণও যে না হইত, তাহাও নয়।

ইহার পর, বাড়ীতে মাষ্টারের কাছে ইংরাজী পড়া আরম্ভ হইল। তখন জ্যোতিবাবুর অভিভাবক হইলেন, তাঁহার সেজদাদা (স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। হেমেন্দ্রবাবুর শিক্ষারীতিও সেকালের অনুরূপ অতি কঠোর ছিল। অষ্টপ্রহর ঘাড় গুঁজিয়া টেবিলে ঝুঁকিয়া পড়িতে হইত। মিছামিছি সময় নষ্ট হইবে বলিয়া, তিনি খেলিতেও ছুটি দিতেন না। যখন বাড়ীর অন্যান্য বালকগণকে খেলিতে দেখিতেন, তখন জ্যোতিবাবুর যে কি কষ্ট হইত, তাহা তাঁহার বর্ণনাতীত। তিনি ভাবিতেন, তিনি যেন জেলখানায় আছেন—সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড তাঁহার নিকট অন্ধকার, জগতে যেন তিনি নিতান্ত একা, অবরুদ্ধ। মুক্তির জন্য তাঁহার প্রাণ ছটফট করিত। হেমেন্দ্রবাবু অবশ্য তাঁহার ভালর জন্যই করিতেন, কিন্তু ইহাতে হিতেবিপরীত হইল। লেখাপড়ার উপর জ্যোতি-বাবুর একটা বিষম বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল। হেমেন্দ্রবাবু জ্যোতিবাবুকে মুগুর-ভাঁজা, ডন-ফেলা প্রভৃতি অনেক রকম ব্যায়াম অভ্যাস করাইতেন, এবং ক্রীড়াচ্ছলে তাঁহাকে সন্তরণ-বিদ্যাও শিখাইয়াছিলেন। এই সকল শিক্ষার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার সেজদাদা হেমেন্দ্রবাবুর নিকট ঋণী।

হেমেন্দ্রনাথ কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজে পড়িয়াছিলেন। বিজ্ঞানে তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও লিখিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সদা



শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

(কৈশোরে)

সর্ব্বদাই তিনি সংস্কৃত কাব্যনাটকাদির আলোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং সর্ব্বদাই আপন মনে সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইতেন। এই সময়ে তিনি ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করিতেছিলেন—এবং তাহাতে তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তিও জন্মিয়াছিল।

হেমেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত অম্বু গুহ সেই সময়কার নামজাদা পালোয়ান ছিলেন। হীরা সিং নামক একজন পাঞ্জাবী উভয়েরই ওস্তাদ ছিল। তলোয়ার গৎকা কুস্তি জিম্‌ন্যাষ্টিক্‌ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ব্যায়াম-ক্রিয়ায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার গুরুভার মুদ্গর অনেক হিন্দুস্থানী পালোয়ান্‌ও উঠাইতে পারিত না।

ছেলেবেলায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পায়ে "কাউর ঘা" ছিল। কত ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল, কিছুতেই সারে নাই। পরে চৌদ্দ বৎসর বয়সে সে ঘা আপনিই সারিয়া যায়। অনেক সময় রোগ অপেক্ষা ঔষধই অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হইত। যে যাহা বলিত, ঘায়ে তাহাই লাগান' হইত। একদিন একজন হিন্দুস্থানী বৈদ্যের ব্যবস্থানুসারে এই ঘায়ে ব্রাণ্ডি দিয়া, এক কড়াই গম্‌গমে আগুনের উপর পা ধরিয়া রাখা হইয়াছিল; সে কি যন্ত্রণা! এই অযথা রক্তস্রাবে তিনি অত্যন্ত ক্ষীণ এবং কৃশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেক সময়ে যাহার যাহা নাই, সেই দিকে তাহার মনের ঝোঁক হয়। বাল্যকালে তাঁহার শরীর অত্যন্ত রুগ্ন ও দুর্ব্বল ছিল বলিয়া বেশী বয়সে অশ্বারোহণ শীকার প্রভৃতি পুরুষোচিত ব্যায়ামচর্চ্চার দিকে যে তাঁহার মন গিয়াছিল, তিনি বলেন—অনেকটা এই কারণে।

বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে বাড়ীতে এইরূপে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। ইহাতে আর কিছু হউক বা না হউক বাড়ীর কঠোর শিক্ষাশাসন হইতে তিনি কতকটা অব্যাহতি পাইলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলিলেন, যদিও শৈশবকাল তাঁহার সুখে কাটে নাই তবুও একটা সুখস্মৃতি, কালো মেঘের পাশে রজতকিরণরেখার ন্যায় তাঁহার চিত্তপটে এখনও পরিস্ফুট রহিয়াছে। সে স্মৃতি বড়ই মধুর।

তখন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে খুব ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব হইত। কুমোরেরা বাড়ীতেই প্রতিমানির্ম্মাণ করিতে আসিত। প্রথম যখন গরুর গাড়ী করিয়া প্রতিমানির্ম্মাণের কাঠাম' আসিয়া পড়িত, তখন হইতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঔৎসুক্য আরম্ভ হইত। তারপর খড়বাঁধা, একমাটি, দোমাটি, রং দেওয়া, মুণ্ড-বসান' প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিমাখানি যখন ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিত তখন তাঁহার আনন্দের আর সীমা থাকিত না। স্কুল হইতে বাড়ী আসিয়াই তিনি ঠাকুরদালানে উপস্থিত হইতেন এবং তন্ময় হইয়া কারিগরদের গঠনকার্য্য নিরীক্ষণ করিতেন। তারপর আবার "চালচিত্র"। কত হাতী ঘোড়া দেবদেবীর মূর্ত্তি পটুয়াদিগের নিপুণ তুলিকায় সাদাজমির উপর নানারঙে ফুটিয়া উঠিত—তিনি এক-মনে বসিয়া তাহাই দেখিতেন; এবং পটুয়াদিগকে মধ্যে মধ্যে পানের খিলি যোগাইয়া মনে মনে বালসুলভ একটা গৌরব অনুভব করিতেন। এক বৎসর "চালচিত্রে"র সময় একটা কৌতুকজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঠাকুরদালানেই গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বসিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা ভগিনী ঐ পাঠশালায় তখন তালপাতায় "ক" "খ"র দাগা বুলাইতেন। (সে ভগিনীর অল্পবয়সেই মৃত্যু হয়)। পটুয়ারা চালচিত্র খানি সম্পূর্ণ করিয়া কেবল কাপড়ঢাকা দিয়া চলিয়া গিয়াছে,—পূজার আর দুই এক দিন মাত্র বাকী,—এমন সময় সেই ভগিনীটির কি এক খেয়াল চাপিল, তিনি চাল হইতে কাপড়খানার ঢাকা খুলিয়া ফেলিয়া, দোয়াতের কালিতে কলম ডুবাইয়া সমস্ত চালখানি কালির পোঁচে চিত্রবিচিত্র করিয়া দিলেন। এতদিনকার সযত্ন-সম্পাদিত চিত্রকর্ম্ম



৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমস্তই এক দণ্ডে পণ্ড হইয়া গেল। বাড়ীতে এক মহা হুলুস্থূলু পড়িয়া গেল। তখন পটুয়াদিগকে ডাকাইয়া যেমন-তেমন করিয়া আবার চাল-খানি চিত্রিত করান' হইল।

তারপর পূজার তিন দিন বাড়ীর উঠানে যাত্রা হইবে। তাহার উদ্যোগ আগে হইতেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সে কি আমোদ! উঠানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বড় বড় কাঠের থাম পোঁতা হইতেছে, তাহার সহিত কাঠের গরাদে জুড়িয়া উঠানের খানিকটা স্থান ঘিরিয়া ফেলা হইতেছে। সেই আবেষ্টিত স্থানে যাত্রা হইবে। উক্ত আবেষ্টনের বাহিরে স্তম্ভ-পরিবেষ্টিত বিস্তৃত পরিসর ভূমির উপর বড় বড় গালিচা পাতা; পাড়ার ছেলেরা আসিয়া মহাউৎসাহে বৈকাল হইতেই তাহার উপর ডিগবাজী খেলিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। কাষ্ঠস্তম্ভের মাথা হইতে বক্র লোহার শিকে ঝাড় ঝুলিতেছে। সায়াহ্নে যখন সেই সব জ্বালান' হইতে লাগিল, তখন ছেলে-মহলে কি আনন্দ! আরতির সময় ধূপধূমে সমাচ্ছন্ন দেবীর অস্পষ্ট মুখখানি তাঁহার মনে অজানা-রহস্যের এক সুন্দর মোহ-জাল বিস্তার করিত। বাড়ীর ছেলেদের অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া চাকরেরা সকাল-সকাল বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া বলিত যে, ভোরের সময় আসিয়া তাহারা আবার যাত্রা শোনাইতে লইয়া যাইবে। বালক জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের যাত্রা শুনিবার জন্য চোখে ঘুম আসিত না। এগারটা রাত্রে যেই ঢোলে চাঁটি পড়িল অমনি বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একছুটে তিনি বাহিরের মজ্‌লিশে গিয়া হাজির হইতেন। উঠানে লোকে লোকারণ্য। বাহিরের নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই ভিড় করিয়া চারিদিকে দাঁড়াইয়া। এই তিন দিন *সকলের জন্যই নির্ব্বিচারে অবারিত দ্বার!* অনেকগুলি মশালচী মশাল-হাতে উঠানের চারিদিকে রহিয়াছে। লালপাগড়ীধারী দারোয়ানেরা "বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে" করিয়া লোকদিগকে বসাইবার চেষ্টা করিতেছে এবং

মধ্যে মধ্যে বেত্রচালনা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। এই যাত্রা কেবল বাড়ীর ছেলে-ছোকরা এবং বাহিরের নিম্নশ্রেণীর লোকেদের জন্যই প্রধানত নির্দ্দিষ্ট ছিল।

বৈঠকখানায় অভিভাবকগণের মজ্‌লিশ্‌। সেখানে বাঈনাচ চলিত। ছেলেদিগকে লইয়া যাত্রা দেখাইবার ভার ছিল দীনুঘোষালের উপর। দীনুঘোষাল জ্যোতিবাবুর পিতৃব্যমহাশয়দের একজন মোসাহেব—সে ছেলেদেরও খুব প্রিয়পাত্র ছিল। দীনু ছেলেদের লইয়া ঠাকুরদালানের রোয়াকে মজ্‌লিশ্‌ করিয়া বসিত এবং মধ্যে মধ্যে রুমালে টাকা বাঁধিয়া ছেলেদের হাত দিয়া "পেলা" দেওয়াইত। তখনকার শ্রেষ্ঠ যাত্রাওয়ালা নিমাইদাস এবং নিতাইদাসের যাত্রাই এ বাড়ীতে হইত। যাত্রাওয়ালা ছোকরাদের পোষাক ছিল—জরির চাপ্‌কান, জরির কোমরবন্দ্‌, এবং পালকওয়ালা মুকুটের মত জরির টুপী। জরি অবশ্য ঝুটা। যে কালে যে পোষাকের ফ্যাশান্‌, যাত্রাওয়ালারাও সাধারণত তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে।

এই যাত্রার "কেলুয়া ভুলুয়া" প্রভৃতি সং ছেলেদের বিশেষ চিত্তাকর্ষক ছিল। "শুম্ভ নিশুম্ভ"র পালায় যখন রক্তবীজ সাজঘর হইতে "রে রে রে রে" করিয়া ডাকাতি হাঁক্‌ দিতে দিতে আসরে আসিত, তখন ছেলেদের একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইত। ডাকাতদের মত তাহার লম্বা চুল, ইয়া চোগোপ্পা, মালকোঁচামারা রক্তবস্ত্র, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, হাতে ঢাল তলোয়ার—সে এক ভীষণ চেহারা। আর মুকুটভূষিতা আলুলায়িত-কেশা দুর্গা যে সাজিত, সে যেন রূপে আলো করিয়া আসিত। আর তাহার তলোয়ার খেলারই বা কি কসরৎ। বন্‌ বন্‌ করিয়া তলোয়ার ঘুরাইত, যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইত। আবার রাক্ষসের মুখোস্‌-পরা ধূম্রলোচন পথসংক্ষেপ করিবার জন্য যখন ছেলেদের বসিবার স্থান,

দালানের রোয়াক দিয়া আসরে নামিত, তখন ছেলেরা সত্যসত্যই ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিত—কেহ কেহ তারস্বরে ক্রন্দনই জুড়িয়া দিত।

এই প্রসঙ্গে জ্যোতিবাবু বলিলেন, "বিজয়ার দিন প্রাতে আমাদের বাড়ীতে বিষ্ণু গায়কের গান হইত। আমরা সকলে বসিয়া একত্রে আগে শান্তির জল লইতাম, তারপর প্রতিমা বাহির করা হইত। অপরাহ্ণে আমরা অভিভাবকগণের সহিত ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে বসিয়া ভাসান দেখিতাম। প্রতিমা-বিসর্জ্জনের পর বাড়ী আসিয়া বুকটা বড়ই ফাঁক ফাঁক ঠেকিত—মনটাও কেমন একটু খারাপ হইয়া যাইত। প্রথম-প্রথম কয়েক দিন খুবই কষ্ট-বোধ হইত।

"এই দুর্গোৎসবে—দেব, মানব ও দানব এই তিন ভাবের দৃশ্যই দেখা যাইত। বিজয়ার দিন, সকল শত্রুতা ভুলিয়া বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন, গুরুজন বলিয়া প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ এবং কণিষ্ঠদিগকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদের যে ধূম পড়িয়া যাইত—তাহাতে আমার মনে হয়, এ যেন একটা স্বর্গীয় ভাবের প্রেরণা। মানব ভাব,—যেমন কোন আত্মীয়ার আগমনে হর্ষ এবং বিদায়কালে অশ্রুপাত। দেবীকে "মা মা" বলিয়া ডাকিয়া,ভক্তিগদ্‌গদ-চিত্তে সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, হৃদয়ে যে কি অপূর্ব্ব আনন্দ ও প্রীতি জন্মিত, তাহা কথায় বলা যায় না। আবার সেই দেবীর বিসর্জ্জনে মানব-হৃদয় বিয়োগ-ব্যথায় জর্জ্জরিত হইয়া সত্যসত্যই অশ্রুবন্যায় গলিয়া গলিয়া ঝরিয়া পড়িত। এইরূপে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব কোমলতা বিকশিত হইত! অপর দিকে, চালচিত্রঅঙ্কনে ও প্রতিমানির্ম্মাণে চিত্রশিল্পের ও ভাস্কর্য্য-বিদ্যারও একটা উন্নতি এদেশে বহুকাল হইতে পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কৃষ্ণনগরের কুমোর-পটুয়াদের এ বিষয়ে এত উৎকর্ষ-লাভের ইহাই একটা প্রধান কারণ বলিয়া আমার মনে হয়। এই উৎসবে মানুষের হৃদয়ে দেবভাব ও মানব-ভাব যেমন উদ্বোধিত হয়, তেমনি

দানবভাবও আর একদিকে দ্রষ্টব্য। পূজার আরম্ভ হইতেই চতুর্দ্দিবসব্যাপী মন্তের ছড়াছড়ি। টেকচাঁদ ঠাকুরের কথামত—"সিদ্ধিরস্তু" শুধু নয়, "অ-আ" পর্য্যন্ত গড়াইত। দ্বিতীয়ত, পশু-বলিদান। এ এক বীভৎস-তর ব্যাপার! বড় বড় মহিষ ছাগ প্রভৃতির রক্তে পূজাঙ্গনে রক্তবন্যা বহিয়া যাইত,—এই রক্তকর্দ্দমিত স্থান দেখিলে মানবমাত্রেরই মনে যে এক অতি নিষ্ঠুর দানব ভাব জাগিয়া উঠে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের বাড়ীতে অবশ্য পশুবলি হইত না, কুম্ড়া বলিতেই কায হইত। কিন্তু বলির নামে সমারোহ-সহকারে যে হত্যা সংসাধিত হয়—তাহাকে মানব-হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ-বৃত্তির পরিচায়ক মোটেই বলা চলে না। যাহা হত্যা—তাহা সকল কালে, সকল অবস্থাতে, এবং সকল অজুহাতেই হত্যা। সুতরাং পাশবিক, অমানুষিক এবং সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয়। জগদীশ্বরী জগন্মাতার সম্মুখে তাঁহার সৃষ্ট নির্দ্দোষী জীবকে হত্যা করায় দেবী কখনই সন্তুষ্ট হন না।

"পূজার সময় আমার পিতৃদেব কখনও বাড়ীতে থাকিতেন না—কোথাও না কোথাও ভ্রমণে বহির্গত হইতেনই। পূজার ভার আমার দুই কাকা, স্বর্গীয় গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাশয়দের উপরই ন্যস্ত থাকিত।

"মেজ কাকা (৺গিরীন্দ্রনাথ) বিজ্ঞানের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার একটি পরীক্ষাগার (Laboratory) ছিল, তাহাতে Battery প্রভৃতি নানাবিধ যন্ত্র ছিল। তাহা দ্বারা তিনি অনেক বিষয়ের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিতেন। তিনি খুব ভাল গানরচনাও করিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত "বাবুবিলাস" নামে যাত্রা, আমাদের বাড়ীতে একবার অভিনীত হইয়াছিল। আমরা তখন খুব ছোট, উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিয়াছিলাম, মনে আছে। উদ্যানরচনাতেও তাঁহার বিশেষ ঝোঁক



৺গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছিল। শেষোক্ত সখটি শেষে গুণ-দাদাতেও (তাঁর পুত্র ৺গুণেন্দ্র-নাথ ঠাকুর মহাশয়েও) বর্ত্তাইয়াছিল। তিনিও খুব সুন্দররূপে বাগান গড়িতে পারিতেন।

"ছোটকাকামহাশয় (৺নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর) আমার দাদামহাশয় ৺দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলাত গিয়াছিলেন। সেইখানেই তাঁহার শিক্ষা হয়। ইংরাজী সাহিত্যে তিনি বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার হৃদয় অতিশয় কোমল এবং পরদুঃখ-কাতর ছিল। কেহ কোনও বিপদে পড়িলে অথবা ঋণজালে জড়িত হইলে তিনি তাহাকে মুক্ত করিতে ব্যস্ত হইতেন। এই পরোপচিকীর্ষায় তিনি একবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। নিজে ঋণ করিয়াও অপরকে ঋণমুক্ত করিতেন। এইরূপে পরের জন্য শেষে তিনি নিজেই বিষম ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিজে যখন এমনি বিপন্ন, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি Customs Houseএ Collectorএর কার্য্য গ্রহণ করেন। বাঙ্গালীকে তখন এ পদ দেওয়া হইত না। ছোটকাকামহাশয়ই দেশীয় লোকের মধ্যে এ কার্য্যে সর্ব্বপ্রথম নিযুক্ত হয়েন।"

এই সময়কার আরও একটি ঘটনা জ্যোতিবাবুর বেশ মনে পড়ে। তিনি বলিলেন, "আমার বেশ মনে আছে, একবার বর্দ্ধমানের মহারাজা শ্রীযুক্ত মহাতাব্‌চাঁদ বাহাদুর আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। মহারাজকে দেখিবার জন্য সদর রাস্তা ও আমাদের গলিতে একেবারে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। এখন দেখা যায় রাজাদের মধ্যে একটা Democracyর spirit জাগিয়াছে, তাঁহারা অনেক স্থলেই গমন করেন। ইহা অবশ্য ভালই তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু তখন এ ভাব ছিল না। মহারাজ মহাতাব্‌চাঁদের ব্রাহ্মসমাজের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল। তিনি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের

(মহর্ষির) একজন খুব প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি বর্দ্ধমানে ব্রাহ্মসমাজ-স্থাপনে ইচ্ছুক হইয়া মহর্ষির নিকট আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন এমন একটি লোক প্রার্থনা করেন। মহর্ষি ইতিপূর্ব্বে যে চারিজন পণ্ডিতকে বেদশিক্ষার জন্য কাশীতে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই একজনকে আচার্য্যের পদে বৃত করিয়া বর্দ্ধমানে পাঠাইয়া দেন। বর্দ্ধমানে ব্রাহ্ম-সমাজের কাযকর্ম্ম বেশ সুচারুরূপেই চলিতেছিল, এমন সময় কেশব বাবু ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন। কেশব বাবুর কার্য্যকলাপ এবং আচার ব্যবহারে মহারাজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, বর্দ্ধমান হইতে ব্রাহ্মসমাজ উঠাইয়া দিয়া, সমাজের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন।”



৺নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কৈশোর-স্মৃতি

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গুরুমহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা এবং মাষ্টারমহাশয়ের নিকট একটু ইংরাজী পড়িয়া, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। প্রথমে St. Paul's School, তার পর Montague's Academy, তার পর হিন্দুস্কুল। এইরূপ ঘনঘন স্কুলপরিবর্ত্তনে যে ভাল ফল হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। কেন যে এরূপ পরিবর্ত্তন হইত, তাহা তিনিও ভাল বলিতে পারেন না, অভিভাবকেরাই জানিতেন। পূর্ব্বকথিত, বাড়ীর কঠোর শিক্ষাশাসনের ফলে শিক্ষার প্রতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কেমন একটা বিতৃষ্ণাই জন্মিয়া গিয়াছিল; কাযেই স্কুলের পড়ায় তিনি একেবারেই মনোযোগ দিতে পারিতেন না।

ছেলেবেলাকার একটা কথা তাঁহার মনে পড়ে, তাহাতে বেশ একটু মজা আছে। উপনয়নের সময় অন্তঃপুরে একটা ঘরের মধ্যে যথারীতি তিন দিন তিনি বদ্ধ হইয়া আছেন। একদিন হঠাৎ ঘর হইতে শুনিতে পাইলেন "হনুমান" "হনুমান"! এবং উক্ত ভক্ত-বীরের বিদায়-সঙ্গীতের ঐক্যতানে দাসদাসীদের মধ্যে খুব একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। ব্যাপার কিছুই নয়—একটা হনুমান্ ছাদের প্রাচীরের উপর আসিয়া বসিয়াছিল। এমন একটা অপূর্ব্ব দ্রষ্টব্য জীব-দর্শনের লোভ অতিক্রম করা অশূদ্রস্পশ্য বালকব্রহ্মচারীর পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রহ্মচারী দরজা খুলিয়া ঘর হইতে বেগে বাহির হইয়া পড়িয়া, এক লাফে একবারে নিষিদ্ধদর্শন শূদ্রদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত। হনুমান ছাড়িয়া অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে তখন আবার এক নূতন সোরগোল পড়িয়া গেল। তাড়া খাইয়া তখন ব্রহ্মচারী মহাশয় ম্লানমুখে আবার স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

জ্যোতিবাবু তখন হিন্দুস্কুলে পঞ্চম-শ্রেণীতে পড়িতেন। বয়স প্রায় বার কি তেরো, যে রেখা-চিত্রকলার জন্য বিলাতেও আজকাল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রশংসিত হইতেছেন তাহার বীজ অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের সেই বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথেও পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ক্লাসে বসিয়া তিনি একবার তাঁহাদের মাষ্টার জয়গোপাল শেঠের ছবি আঁকিয়াছিলেন। তাঁহার যে চিত্র অঙ্কিত হইতেছিল, এ ব্যাপার মাষ্টার মহাশয় কিছুই জানিতেন না। সে প্রতিকৃতি এমনই অনুরূপ হইয়াছিল যে মাষ্টারদের মধ্যেও তাহা লইয়া কিছুদিন যাবৎ একটা খুব হাসি তামাসা চলিয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনারও দুই এক বৎসর পূর্ব্বে জ্যোতিবাবু তাঁহার জীবনে সর্ব্বপ্রথম চিত্রাঙ্কন করেন। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (অধুনা লর্ড সিংহ) মহাশয়ের পিতৃব্য শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংহ মহাশয় একবার জ্যোতিবাবুর মেজ্‌দাদাকে (সত্যেন্দ্রনাথ) তাঁহার কর্ম্মস্থান মণিরামপুরে নিমন্ত্রণ করেন। জ্যোতিবাবুও তাঁহার মেজ্‌দাদার সঙ্গে সেখানে গিয়াছিলেন। একদিন, কেন কে জানে, প্রতাপবাবুর ছবি আঁকিতে তাঁহার বড় ইচ্ছা হয়। ইহার পূর্ব্বে তিনি আর কখনও কাহারও ছবি আঁকেন নাই, বা আঁকিতে চেষ্টাও করেন নাই। এই ছবিখানি এত সুসদৃশ হইয়াছিল যে বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে চিত্রাঙ্কনের জন্য সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম চিত্র—তখন হইতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ছবি আঁকিবার ক্ষমতাও তাঁহার আছে। তাহার উপর, তাঁহার প্রথম চিত্র দেখিয়াই সকলে যখন প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি মধ্যে মধ্যে বাড়ীর লোকদেরও চেহারা আঁকিয়া হাত পাকাইতে লাগিলেন। সে সকল চিত্র চোতা কাগজেই অঙ্কিত হইত, সেগুলিকে রক্ষা করার কথা তখন কাহারও মনে হয় নাই, কাযেই তাহাদের অস্তিত্বও এখন পঞ্চভূতে। তন্মধ্যে একখানি

ছবি হারানোতে তিনি এখনও বিশেষ দুঃখিত—সে ছবিটি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের। তবুও চিত্রবিদ্যায় রীতিমত শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পান নাই বলিয়া তিনি এখনও ক্ষুব্ধ।

যাহাই হউক,—পূর্ব্বকথিত জয়গোপাল শেঠ নামে তাঁহাদের যে শিক্ষক ছিলেন, তাঁহার চেহারা ও পোষাকের বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শিক্ষক মহাশয় যেমন পাত্‌লা, তেমনি অসাধারণ রকমের লম্বাও ছিলেন। গরুড় পক্ষীর প্রসিদ্ধ নাসিকাটির মত তাঁহার কণ্ঠনালীটি সম্মুখ দিকেই বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল; হাত দুইখানি দুই পাশে প্রসারিত করিয়া, আঙ্গুলগুলি মেলিয়া, লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া, চলিতেন ঠিক যেন হাড়গিলাটির মত; কণ্ঠস্বর একটু অনুনাসিক; হাসিলে তাঁহার মিশি-দেওয়া ক্যালো কালো দাঁতগুলি বাহির হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিকীরণ করিত; তাঁহার দেহবর্ণ তবু একটু ফর্সা ছিল। মাষ্টার মহাশয়ের পরিচ্ছদও ছিল এক অদ্ভুত রকমের। পরিধানে ধুতি, অঙ্গে একটা সাদা লংক্লথের চাপ্‌কান, বুকে ভাঁজ করা একখানা চাদর, পায়ে ফুল্ মোজা এবং মাথায় পর্দ্দায় পর্দ্দায় ভাঁজকরা একটা সাদা পাগড়ী;—এমনি পাগ্‌ড়ীই নাকি তখন সব আফিসের কর্ম্মচারীরা ব্যবহার করিতেন। তাম্বুলরাগ অধরওষ্ঠের সীমা পরিত্যাগ করিয়া চিবুক এবং বক্ষস্থ উত্তরীয় পর্য্যন্ত কখন'-কখন' সবেগে ধাবমান হইত।

একদিন ক্লাসের কতকগুলি ছাত্র পরামর্শ করিয়া, এই শিক্ষক মহাশয় আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার চেয়ারের আসনটিকে বেশ করিয়া মসীরঞ্জিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। মাষ্টার মহাশয় তত লক্ষ্য করেন নাই, যেমন বসিয়াছেন অমনি কালির ছাপে তাঁহার চাপ্‌কানটি তাঁহার পশ্চাতে বিচিত্ররূপে চিত্রিত হইয়া গেল। এবম্বিধ ব্যাপারে তিনি তো চটিয়া একবারে অগ্নিশর্ম্মা! একে একে সমস্ত বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন,

এ কার্য্য কে করিয়াছে। সকলেই অস্বীকার করিল, কিন্তু জ্যোতি বাবু, যে করিয়াছিল তাহার নাম বলিয়া দিলেন। এ জন্য জ্যোতিবাবুকে তাঁহার সহাধ্যায়ীগণের হাতে অনেক লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। ছাত্রেরা তাঁহার বই লইয়া এরূপভাবে লুকাইয়া রাখিত যে, অনেক সময় সে বই আর খুঁজিয়াই পাওয়া যাইত না। পুস্তক অভাবে অনেকদিন পড়া না বলিতে পারায়, মাষ্টারদের নিকট তিরস্কৃত এবং এত ঘন ঘন বই হারান'র জন্য বাড়ীতে অভিভাবকগণের নিকটও তাঁহাকে ভর্ৎসিত হইতে হইত। এই সমস্ত অবশ্যম্ভাবী নির্য্যাতন তিনি পূর্ব্বে যে কিছুই অনুমান করেন নাই, তাহা নয়; তবুও বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মিথ্যা কথা বলিয়া আপনাদের উচ্চ বংশ-গৌরবকে খর্ব্ব করিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইতে পারেন নাই।

এই সময়ে হিন্দু স্কূল ও সংস্কৃত কলেজের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ চলিত। কারণ কিছুই নহে, বালসুলভ চাপল্যমাত্র। তখনকার দিনে এ এক প্রকার ফ্যাশানের মধ্যেই পরিগণিত ছিল। কখন-কখন এই দুই দলের লড়াইয়ে রক্তারক্তি ও মাথাফাটাফাটি পর্য্যন্ত হইত। হিন্দুস্কূলের ইংরাজ হেডমাষ্টারের নিকট নালিশ আসিলে, তিনি বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না, বোধ হয় সে সময়ে তাঁহার স্বদেশের দুর্দ্দান্ত ছাত্রদের কথাই তাঁহার মনে পড়িত!

মধ্যে হিন্দু স্কূল একবার শ্যাম মল্লিকদের জোড়াসাঁকোর থামওয়ালা বাড়ীতে কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরিত হয়। সেই সময়ে একদিন টিফিনের ছুটিতে জ্যোতিবাবু দেখিলেন যে একটা লোককে স্কূলের হাতার ভিতর হইতে জনৈক কনেষ্টবল থানায় লইয়া যাইবার জন্য ধরিয়া টানাটানি করিতেছে—সে নাকি কি একটা অপরাধ করিয়াছে, তাই তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে কনেষ্টবলটি স্কূলঘর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। জ্যোতিবাবু-প্রমুখ কয়েকজন ছাত্র প্রথমত তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বলেন, কিন্তু

কনেষ্টবল মহাশয় যখন কিছুতেই সম্মত হইলেন না, তখন সকলে মিলিয়া নিকটস্থ ইঁটের একটা ঢিবি হইতে ইঁট লইয়া কনেষ্টবলটির দিকে ছুঁড়িতে লাগিলেন। শেষে পুলিশের সিপাহী মহাশয় এমনি জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলেন যে, তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যপালন মুল্‌তুবী রাখিয়াই সবেগে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিলেন—আর এই ফাঁকে সে লোকটাও বেমালুম কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল।

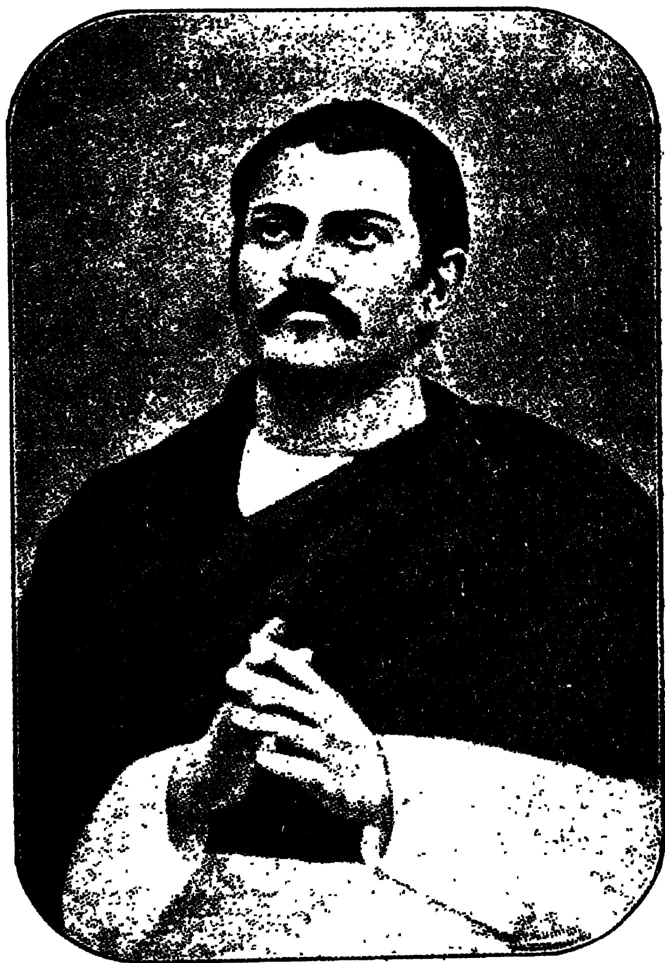
জ্যোতিবাবু একবার তাঁহার মেজ্‌দাদা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ৺মনোমোহন ঘোষের কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে কিছুকাল অবস্থান করেন। সেও তাঁহার একটি সুখের স্মৃতি। তখন মিষ্টার ঘোষের পিতা মাতা উভয়েই জীবিত ছিলেন। তাঁহারা যেরূপ যত্ন করিতেন, তিনি বলেন, তাহা কখনও ভুলিবার নহে। তখন ঘোষ-পরিবারের মধ্যে অবরোধপ্রথা পূর্ণমাত্রায় থাকা সত্ত্বেও, অন্তঃপুরে তাঁহাদের অবাধগতি ছিল। মিসেস্ ঘোষ তখন বালিকা বধূ। বারাণ্ডায় মাদুর পাতিয়া তাঁহার সঙ্গে বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাস খেলিতেন। মনোমোহনবাবুর পিতা লোলচর্ম্ম বৃদ্ধ রামলোচনবাবু যেরূপ গম্ভীর কণ্ঠস্বরে এবং তাঁহার বড় বড় চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া "অ—ম—ন্—ম—হ—ন্" বলিয়া ডাক দিতেন, তাহা কখনই ভুলিবার নয়। আর ভুলিবার নয়, কৃষ্ণনগরের দুগ্ধফেননিভ শুভ্র ফুরফুরে সেই "গঙ্গাজলী" সন্দেশ এবং তাঁহাদের বাড়ীর চা! সে চা'য়ে কি সুগন্ধ! এমন চা, জ্যোতিবাবু বলিলেন, আর কখনও তিনি খান নাই। আসল কথা, ছেলেবেলাকার সকল অনুভূতিই একটু বেশী মাত্রায় তীব্র হইয়া থাকে। তিনি লালমোহনবাবুর সঙ্গে একটা বড় খাটে একসঙ্গে শয়ন করিতেন।

একদিন তাঁহাদের বাড়ীর সংলগ্ন দীর্ঘ তরুবীথির মধ্যে মনোমোহন-বাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু দুইজনে পায়চারী করিতে করিতে বিলাত যাইবার

মৎলব আঁটিতেছিলেন—লালমোহন বাবু তাই শুনিয়া অমনি হাসিতে হাসিতে পিছন হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিলেন "দাদা, the Steamer is ready !"

তখন কেশববাবু ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কি উৎসাহ ও আনন্দ! কেশববাবুর সহিত খৃষ্টান পাদ্রী লালবিহারী দে ও কৃষ্ণনগরের Dyson সাহেবের তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল! আজ লালবিহারীবাবু কেশববাবুর বক্তৃতার প্রতিবাদ করিয়া বক্তৃতা দিবেন! আজ কেশববাবু আবার সেই প্রতিবাদের উত্তর দিবেন! এই রূপ প্রায়ই কিছু না কিছু একটা হৈ চৈ থাকিতই। উভয় পক্ষই বাগ্‌-যুদ্ধে বিশেষ মজ্‌বুত ছিলেন। লালবিহারী দে সুন্দর ইংরাজীতে কেশব-বাবুকে ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু পরিহাস-বাণ-প্রয়োগে কেশববাবুও বড় কম দক্ষ ছিলেন না। লালবিহারীর বক্তৃতা লিখিত, কেশববাবুর মৌখিক, সুতরাং সেই ওজস্বিনী বক্তৃতার তোড়ে রেভারেণ্ড লালবিহারীর সমস্ত ঠাট্টা-মস্করা কোথায় ভাসিয়া যাইত। কেশববাবুর দলই শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করিত! তাঁহারা ছেলের দল, এই জয়োল্লাসে খুব মাতিয়া উঠিতেন আর চিৎকার করিয়া কেশববাবুর জয় ঘোষণা করিতেন।

এই সময়ে প্রতি বৎসর ১১ই মাঘ তারিখে ইঁহাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ব্রাহ্মোৎসবের খুব ঘটা হইত। সমস্ত বাড়ী পুষ্পমালায় ভূষিত হইত। প্রত্যূষে যখন রশুনচৌকিতে প্রভাতী বাজিয়া উঠিত তখন তাঁহার যে কি আনন্দ হইত তাহা তিনি কথায় বর্ণনা করিতে পারেন না। আদিব্রাহ্মসমাজে প্রাতঃকালের উপাসনা সমাপ্ত হইয়া গেলে, দলে দলে ব্রাহ্মেরা জোড়াসাঁকোর বাটীতে আসিয়া সমবেত হইতেন। টেবিলের উপর বড় বড় দরবেশী মিঠাই ও কমলা



ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

'লেবুর পিরামিড সাজান' থাকিত। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ভাই প্রতাপ মজুমদার, ভাই মহেন্দ্রনাথ, ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু—"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে"র একজন প্রচারক ও যিনি "Unity and Minister" কাগজের সম্পাদক ছিলেন—সম্প্রতি তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে—ভাই উমানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হরদেব চট্টোপাধ্যায়—ইঁহাদের উৎসাহদীপ্ত আনন্দ-বিকশিত মুখ জ্যোতিবাবুর চিত্তফলকে এখনও সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। মধ্যাহ্নভোজনের পর বৈঠকখানার ঘরে গগনভেদী উচ্চকণ্ঠে "সবে মিলে মিলে গাও", "আজ আনন্দের সীমা কি", "আজি সবে গাও আনন্দে" প্রভৃতি সত্যেন্দ্রনাথের রচিত গানগুলি সকলে মিলিয়া গাহিতেন। জ্যোতিবাবু বলিলেন, "সর্ব্বশেষে হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন মহা উৎসাহের সহিত স্বরচিত 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ডঙ্কা বাজিল' প্রভৃতি গান গাহিতেন, তখন যে কি পবিত্র স্বর্গীয় আনন্দে আমাদের মন ভরিয়া উঠিত, তাহা বর্ণনাতীত। সেকালের দুর্গাপূজার সেই আনন্দ এবং এ-কালের এই ব্রহ্মোৎসবের আনন্দ, এ উভয়ের মধ্যে যেন স্বর্গ মর্ত্ত্যের প্রভেদ! এ এক ছবি, আর সে এক ছবি।"

এই খানে হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয়ও প্রদত্ত হইল। "উচ্চ কুলীন ব্রাহ্মণবংশে ইঁহার জন্ম। ইনি ইংরাজী-শিক্ষা একেবারেই পান নাই। সেকেলে রীতি-অনুসারে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটু বাঙ্গলা ও একটু ফার্শী জানিতেন মাত্র। কিন্তু প্রাচীনতন্ত্রের লোক হইলেও ইনি খুব সৎসাহসী ও সমাজসংস্কারের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। যখন মেয়েদের শিক্ষার জন্য বেথুন-স্কুল খোলা হয়, ইনিই সর্ব্বাগ্রে সাহসপূর্ব্বক তাঁহার দুইটি কন্যাকে বেথুন-স্কুলে পাঠাইয়া দেন। ইনি গৃহী হইয়াও ভগবদ্ভক্ত সন্ন্যাসী। ইঁহার গোঁপ-দাড়ি কামানো, মস্তক মুণ্ডিত এবং মাথায় একটি

শিখা ছিল। •ভূতে দয়া এবং বিশ্বপ্রেমে তাঁহার হৃদয়খানি সদাসর্ব্বদাই পরিপূর্ণ ছিল। মুখটি নিয়ত প্রফুল্ল। পরিধানে গৈরিক বসন। একটা ঔষধের কৌটা অনবরত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিত। তিনি দীন-দুঃখীগণকে ঔষধ বিতরণ করিতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি ধর্ম্ম ও সামাজিক গান নিজেই রচনা করিয়া গাহিতেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে যাহাতে সৎসাহসের আবির্ভাব হয়, এই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন দেশের সাহসের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গান বাঁধিতেন ; যথা—

"ব্যাটা ছেলের * * * কড়ি সর্ব্বলোকে কয়
কলম্বস্ নাবিক ছিল সাহসে আমেরিকা গেল
দেশের বার্ত্তা জেনে শেষে দেশটি করলে জয়।"
ইত্যাদি।

ইঁহার রচিত গানগুলি শেষে ৺প্যারিচাঁদ মিত্র মহাশয় নিজব্যয়ে ছাপাইয়া দেন। তিনি যে কি সূত্রে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা আমি সঠিক জানি না। ইঁহারই উক্ত দুই কন্যার সহিত শেষে পর পর ৺হেমেন্দ্রনাথের এবং বীরেন্দ্রনাথের (জ্যোতিবাবুর ন'দাদার) সহিত বিবাহ হয়।"

সেকালের কলিকাতা—

গৃহ ও সমাজ-স্মৃতি

জোড়াসাঁকো বাড়ীতে ছেলেদের জন্য একটি ধর্ম্মপাঠশালাও খোলা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ পড়াইতেন। উপনিষদের শ্লোকগুলি হ্রস্বদীর্ঘ রক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ উচ্চারণসহকারে সমস্বরে পাঠ করান হইত। যেখানে এক সময় গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বসিত, দুর্গাপূজা হইত, সেই পূজার দালানই পরে বেদমন্ত্র পাঠে মুখরিত হইয়া উঠিল। এই পাঠশালায় কতকগুলি বাহিরের ছেলেও পড়িতে আসিত। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী একজন। তখন হইতেই অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে জ্যোতিবাবুর বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা গাঢ়তর হইয়া উঠে, এবং তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত এ বন্ধুত্ব অক্ষয় ও অক্ষুণ্ণ ছিল।

ছেলেবেলায় অক্ষয়চন্দ্রকে জ্যোতিবাবুদের বাড়ীর সকলেই "Poet" "Poet" বলিয়া ডাকিতেন। তখন হইতেই তিনি ছোট ছোট কবিতা লিখিতেন এবং জ্যোতিবাবুকে শুনাইতেন। একটু ফাঁক পাইলেই তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে জ্যোতিবাবুও আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন।

শীতকালে এক একদিন রাত্রি ৩।৪ টার সময় আসিয়া, জ্যোতিবাবুকে শয্যা হইতে উঠাইয়া লইয়া, অক্ষয়চন্দ্র প্রত্যূষভ্রমণে বহির্গত হইতেন। তখনকার কালে শীতকালেই সকলে প্রাতর্ভ্রমণ (morning walk) করিত। বেশ করিয়া শীতবস্ত্র চাপাইয়া ও গলায় কম্ফর্টার (comforter) জড়াইয়া, ৩।৪টা রাত্রে তাঁহারা দুইজনে বেড়াইতে বাহির হইতেন;

এবং ঘোড়দৌড়ের মাঠ প্রভৃতি ঘুরিয়া ফিরিয়া বেলা প্রায় দশটার সময়ে বাড়ী ফিরিতেন। একদিন ইঁহারা ফিরিতেছেন, কেশববাবু গাড়ী করিয়া যাইতেছিলেন, মুখ বাড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিহে তোমাদের এখনও morning walk হচ্ছে নাকি?" এক একদিন Eden's Park-এ যখন পৌঁছিতেন, তখনও রাত্রি থাকিত। চৌকিদার হাঁক দিয়া (challenge করিয়া), বলিত—"হুকুম্—সদর" (who comes there?)।

জ্যোতিবাবু বলিলেন—"ধনী ও গরীব লোকেদের মধ্যে গরম কাপড়ের তখন তেমন বিশেষ কিছু তফাৎ ছিল বলিয়া মনে হয় না। অল্প পয়সার লোকেরা শীতকালে দোলাই ব্যবহার করিত। এখন যেমন সস্তা বিলাতী শাল প্রভৃতি পাওয়া যায়, তখন তাহা ছিল না। ধনীরা শীতকালে শাল দোশালা জামিয়ার রেজাই প্রভৃতি ব্যবহার করিত। এখন যেমন রেশ্মী চাদরের ফ্যাসান হইয়াছে (বোধ হয় সস্তা বলিয়া) তখন তাহা ছিল না।"

পথে বাহির হইয়া কে কি করিতেন,—তাহার বর্ণনায় জ্যোতিবাবু বলিলেন,—"বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই পথে আমরা নানারূপ ছেলেমানুষী বাক্যালাপ ও হাস্যকৌতুক সুরু করিয়া দিতাম। তাহাতে পথের শ্রান্তি আদৌ অনুভব করিতাম না। একদিন যাইতে যাইতে আমাদের এই এক খেলা হইল—যে, কে আগে কয়টা গ্যাস-লাইটের খুঁটি দেখিতে পায়। খুব দ্রুত চলিতে চলিতে আমি বলিলাম, "ঐ একটা" অক্ষয় বলিল, "ঐ একটা"। এই রকম যার নজরে যত বেশী পড়িত, সেদিন তাহারই জিত হইত!

"তখন শীতকালেই morning walk হইত এবং শীতকালেই আমাদের চায়ের বরাদ্দ ছিল। এ চা চীনদেশের চা—তখনও আসামের



স্বর্গীয় কবিবর অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

চা আমাদের দেশে প্রচলিত হয় নি। সে চায়ের কি সুগন্ধ! আমাদের অন্তঃপুরের রক্ষক একজন বাঙ্গালী বৃদ্ধ লাঠিয়াল্ সর্দ্দার ছিল। সকলের চায়ের পেয়ালায় যে চা-টুকু পড়িয়া থাকিত, তাহাই জমা করিয়া, চক্ষু মুদিয়া, খুব আরাম করিয়া সে প্রতিদিনই সেইটুকু খাইত। তখন বাহির মহলে হিন্দুস্থানী দারোয়ান্ ও অন্দরে বাঙ্গালী সর্দ্দার দিবারাত্র পাহারা দিত। সর্দ্দার রাত্রে ডাকাতি হাঁকের মত যখন হাঁক দিত, তখন আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, এবং ভয়ে বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া উঠিত।

"তখন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে দুইজন করিয়া ডাক্তার বাৎসরিক বেতনে নিযুক্ত থাকিতেন—একজন ইংরাজ ও একজন বাঙ্গালী। গুরুতর রোগ না হইলে সাহেব-ডাক্তারকে কখনও ডাকা হইত না। সাহেব-ডাক্তারের উপর তখন সকলেরই অসীম বিশ্বাস ছিল। সৌভাগ্য-ক্রমে এখন সে বিশ্বাস অনেকটা চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী বড় ডাক্তারের অধীনে একজন অল্পবেতনের হাতুড়ে ডাক্তারও থাকিতেন। তিনি বাড়ীতে অষ্টপ্রহর হাজির থাকিতেন এবং বড় বড় ডাক্তারেরা যে সব ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন, এই হাতুড়ে ডাক্তারটি সেই অনুসারে নিজের হাতে ঔষধপত্রাদি দিতেন এবং ঠিক ঠিক সময়ে সেবন করাইতেন। ইনি অনেকটা শুশ্রূষাকারিণী নার্সের মত। আমাদের আমলে পীতাম্বর নামে একজন বৃদ্ধ এই শেষোক্ত সর্ব্বকনিষ্ঠ ডাক্তার ছিলেন। ছেলেরা তাঁহাকে খুব ভালবাসিত, তাঁহার নিকট সকলে গল্প শুনিত। তাঁহার বগলে নিয়তই কাপড়ে মোড়া খোপকাটা একটা টিনের বাক্স থাকিত। তাহার খোপে খোপে নানা রকম রঙের মলম থাকিত। ছেলেদের ফোঁড়া পাঁচ্ড়া হইলে এই সব মলম লাগান হইত। ছেলেদের ভুলাইবার জন্যই বোধ হয় তিনি এইরূপ নানা রঙ-বেরঙের মলম রাখিতেন।"

জ্যোতিবাবুদের বাড়ীতে এ সময়ে বাঙ্গালী ডাক্তার ছিলেন শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ গুপ্ত এবং সাহেব ডাক্তার ছিলেন বেলি। ডাক্তার-দের সম্বন্ধে জ্যোতিবাবুর স্মৃতি এইরূপ :—"আমাদের জ্বর হইলে দ্বারিবাবু প্রথম দিন আসিয়াই দীর্ঘচ্ছন্দে বলিতেন 'তে—ল্'—অর্থাৎ Castor Oil। এই তেলের নাম শুনিলেই আমাদের আতঙ্ক উপস্থিত হইত। তাঁহার চিকিৎসায় একটা ধরা-বাঁধা নিয়ম ছিল ; ফলে এইরূপ চিকিৎসার নিয়মেই তিন দিন বড় জোর সাত দিনের মধ্যেই আমরা খাড়া হইয়া উঠিতাম। চিকিৎসার ঔষধ যেমন তিক্ত, পথ্যও ছিল, তেমনি অরুচিকর—"জল সাবু", "চিনির মুড়্কি", "এলাচ দানা" ইত্যাদি। তখন ব্রাহ্মণের দোকানে খট্‌খটে একরকম বিস্কুট হইত, কখন কখন সেই বিস্কুট ; আর তৃষ্ণা পাইলেই গরম জল। ৺ দ্বারিকানাথ গুপ্তের সর্ব্বজনবিদিত ঔষধই এখন "ডি-গুপ্তর মিক্‌শ্চার"—চলিত কথায় "ডি-গুপ্ত" ঔষধ নামে বিখ্যাত। শুনিতে পাই, বেলি সাহেবের ব্যবস্থা-পত্র অনুসারেই দ্বারিবাবু নাকি জ্বরের এই ঔষধটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

"ডাক্তার বেলি অতি সদাশয় লোক ছিলেন। রাত্রে কেহ তাঁহাকে ডাকিতে গেলে, তাঁহার স্ত্রী তাহার উপর খড়্গহস্ত হইতেন। তবে আমাদের বাড়ী হইতে কেহ গেলে, তাঁর স্ত্রী তেমন নিষেধও করিতে পারিতেন না, করিলেও তিনি তাহা শুনিতেন না ; বলিতেন, 'Governor তাঁর হস্তে বাড়ীর স্বাস্থ্যরক্ষার ভার দিয়া শিমলা-পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি কখনই কর্ত্তব্য-অবহেলা করিতে পারিবেন না।' বেলিসাহেব বালক রবীন্দ্রকে বড় ভালবাসিতেন, দেখা হইলেই রবিকে "Robin, Robin" করিয়া আদর করিতেন।"

তাৎকালীন কলিকাতা সহরের এবং পানীয় জলের দুরবস্থা সম্বন্ধে জ্যোতিবাবুর স্মরণ আছে যে—"তখন কলিকাতায় খোলা নর্দ্দমা ছিল।



স্বর্গীয় ডাক্তার দ্বারিকানাথ গুপ্ত—(ডি. গুপ্ত)

চারিদিকেই দুর্গন্ধ। তখন সহরের যত ময়লা সব গঙ্গায় ফেলা হইত—গঙ্গার জলে সর্ব্বদাই ময়লা ভাসিত; কিন্তু গঙ্গাস্নানের সময় সেই সব ময়লা বা তজ্জনিত দুর্গন্ধসত্ত্বেও আমাদের চিরদিনের সংস্কারবশত মনে কোনই দ্বিধা হইত না। অভ্যাস ও সংস্কারের এমনি মাহাত্ম্য! সন্ধ্যার প্রারম্ভেই মশকমণ্ডলী মাথার উপর বোঁ বোঁ শব্দে মণ্ডলাকারে নৃত্যসহকারে সঙ্গীত জুড়িয়া দিত। সে মধুর সঙ্গীত এখন আর বড় শোনা যায় না। তখন বেচারারা নিশ্চিন্ত ছিল—তাহাদের উপর লক্ষ্য করিয়া তখনও কামান্ পাতা হয় নাই।

"তখন কলের জলও ছিল না। লালদীঘি হইতে পানীয় জল আসিত। মাঘমাসে গঙ্গা হইতে জল আনাইয়া বড় বড় জালা ভরিয়া রাখা হইত। তাহাতেই সম্বৎসর কায চলিয়া যাইত। তখন আমাদের বাড়ীর পুকুরের সঙ্গে গঙ্গার যোগ ছিল। আমার দাদামহাশয় স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ ঠাকুর (Prince Dwarikanath) গবর্ণমেণ্ট বা ম্যুনিসিপ্যালিটির হস্তে এক থোকে কিছু টাকা দিয়া, গঙ্গা হইতে আমাদের পুকুর পর্য্যন্ত একটি পাকা লহর কাটাইয়া লইয়াছিলেন। পুকুরের জল শুকাইলেই সেই লহর দিয়া গঙ্গার জল আনা হইত। ঝর্‌ণার মত ঝর্‌ঝর্ করিয়া সেই শুভ্র ফেনিল জলরাশি যখন আমাদের পুকুরে আসিয়া পড়িত, তখন আমাদের বড়ই আনন্দ হইত। আমরা পাড়ে দাঁড়াইয়া মুগ্ধনেত্রে সেই জলধারা দেখিতাম। এখনকার ম্যুনিসিপ্যালিটি কিছু ক্ষতিপূরণের টাকা ধরিয়া দিয়া আমাদের সে লহরটি এখন উঠাইয়া দিয়াছেন।"

এই সময়ে জোড়াসাঁকোর বাটীতে একজন মালিনী ছিল, সে প্রতিদিন ফুল যোগাইত। অন্তঃপুরের জন্য ফুলের মালা এবং বাবুদের গুড়্‌গুড়ির মুখনলের জন্য ফুলের ভূষণ সে নিত্যই প্রস্তুত করিয়া দিয়া যাইত। "হুঁকা-বর্‌দার্" বলিয়া তামাক সাজিবার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ

ভৃত্য নিযুক্ত থাকিত। জ্যোতিবাবু বলেন, "বাস্তবিক তাহার সাজা তামাকের ধূমোত্থিত সুগন্ধে ঘর আমোদিত হইয়া উঠিত। আর এই গভীর বিষয়ে তাহার সবিশেষ পারদর্শিতা সারাদিনই পরিলক্ষিত এবং প্রমাণিত হইত। তাহার সাজা তামাকে কখনও কাহাকেও "ধর্‌ল না, আগুন হ'লো না, বা সুবিধে হল না" বলিতে শুনি নাই।"

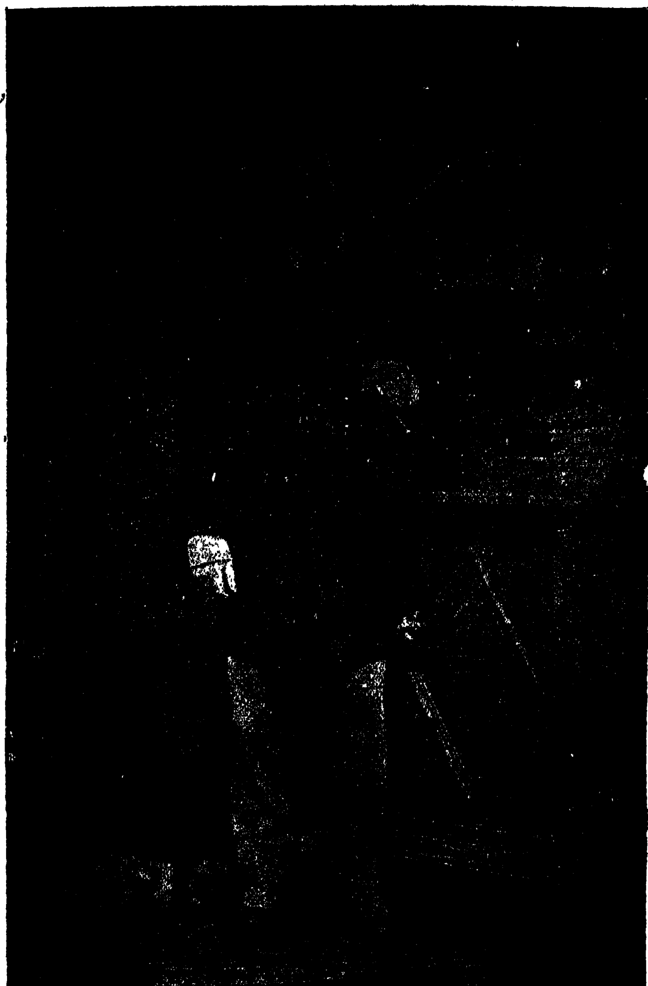
একজন "ভবিষ্যযুক্ত" তিলক-কাটা বৈষ্ণবী আসিতেন, তিনি অন্দরে মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতেন। গিব্রেল্ নামে একজন ইহুদী ছিল, সে আতর গোলাপ প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য সরবরাহ করিত। সে এ বাড়ীর বড়ই অনুগত ছিল, সকল ক্রিয়াকর্ম্ম আমোদ-উৎসবেই সে বাড়ীর লোকদের সঙ্গে যোগ দিত। তাহাকে দেখিলেই জ্যোতিবাবু আতর চাহিতেন, সে অমনি তুলায় লাগাইয়া একটু আতর ইঁহাকে দিত। 'বাচ্চা' বলিয়া একজন কাবুলীওয়ালা জ্যোতিবাবুদের বাড়ীতে বেদানা পেস্তা প্রভৃতি ফল সরবরাহ করিত; সে ছেলেদিগকে তার ঝুলির ভিতর ভরিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া ভয় দেখাইত—এজন্য ছেলেরা তাহাকে খুব ভয় করিত। সদর দেউড়ীতে দারোয়ান ছিল, এবং প্রত্যেক বাবুর বসিবার ঘরের (Drawing Room) দরজায় এক-একজন করিয়া হর্‌করা থাকিত। কোনও অভ্যাগত অথবা অন্য কোনও ব্যক্তি আসিলে, সেই হর্‌করা গিয়া বাবুকে আগে সংবাদ দিত। কোনও ভৃত্যকে ডাকিতে হইলেও সেই ডাকিয়া দিত। বাবুদের প্রত্যেক বৈঠকখানাতেই ফরাশবিছানো; মাঝ-খানে মছলন্দ পাতা, তাকিয়া দেওয়া, গদিওয়ালা একটা উঁচু বসিবার আসন থাকিত—তাহাতেই একেলা বাবু বসিতেন। নীচের ফরাশে অভ্যাগত ও মোসাহেবগণ বসিত। এরূপ বিছানা এখন বিবাহ-সভায় বরের জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহাই হউক, এ সবই ছিল সেকেলে' নবাবী আমলের চা'ল ও কায়দা।

উক্তরূপ মুসল্‌মানী সভ্যতা এবং এখনকার ইংরাজী সভ্যতায় তখন যে এক সংঘাত চলিতেছিল, তাহার আলোচনা করিয়া জ্যোতিবাবু বলিলেন যে—"তখন মোগলাই সভ্যতার সঙ্গে ইংরাজী সভ্যতার একটা যুঝাযুঝি চলিতেছিল—দেখা যাইতেছে, জয়ী হইয়াছে ইংরাজী সভ্যতা। বৈঠকখানা হইতে সে গদীপাতা বিছানা উঠিয়া গিয়াছে, তাহার স্থানে আসিয়াছে Drawing Roomএ কৌচ্‌ কেদারা। তখনকার aristocracyর ভাবটা গিয়া এখন (সাম্যের যুগে) democracyর spiritটাই প্রবল হইয়াছে। এরূপ aristocracy যে শুধু আমাদের বাড়ীতেই নিবদ্ধ ছিল, তাহা নহে,—তখনকার সমস্ত বড়লোকদের ঘরেই এই একই রকমের প্রথা ছিল। কিন্তু মহর্ষির কক্ষটি ছিল অত্যন্ত সাদাসিদে রকমে সজ্জিত—সেখানে আসনের উচ্চ নীচ কোন পার্থক্যই ছিল না। ব্রাহ্ম-সমাজ এবং মহর্ষির সদ্দৃষ্টান্তই আমাদের পরিবারের মধ্যে democracyর ভাবটা আনিয়াছে। পূর্ব্বে এ ভাবটা ছিল না, আর ইহার যে ঈদৃশ পরিণতি ঘটিবে, তাহাই বা তখন কে জানিত!

"দুইটি বিভিন্ন সভ্যতা বঙ্গদেশকে দুই দিক হইতে যখন এইরূপ সজোরে আঘাত করিতেছিল, আমরা ঠিক সেই সময়ে জন্মিয়া দুই রকমই দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। পূর্ব্বে পোষাক ছিল চোগা, চাপকান্‌, কাবা, পাগড়ী; এখন হ্যাট, কোট, ওয়েষ্টকোট এবং পেণ্টুলন! ভাষায় পূর্ব্বে ফারশী আরবী শব্দেরই আধিক্য ছিল, এখন হইয়াছে ইংরাজী। বড়মান্‌ষী আহার তখন ছিল কালিয়া পোলাও কোর্ম্মা কোপ্তা কাবাব প্রভৃতি মোগলাই রকমের, এখন ইংরাজী মতে চপ কাট্‌লেট্‌ পুডিং রোষ্ট প্রভৃতি হইয়াছে। গৃহসজ্জাও তদ্রূপ, আগেই বলিয়াছি। কিন্তু বেশ দেখা যাইতেছে কোনটিই একাধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। প্রত্যেক সভ্যতাই আমাদের হিন্দু-সভ্যতার উপর এক-একটা পলি বা স্তর

রাখিয়া গিয়াছে মাত্র। কাযেই হিন্দু মুসলমানী এবং ইংরাজী এই তিন সভ্যতার উপাদান একত্র হইয়াছে, আঘাত না করিয়া ভাব করিয়াছে, এবং যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি করিয়াছে। এ সন্ধির ভাবটা এখন আমাদের সব কাযেই প্রকাশিত হইতেছে। যেমন হিন্দুমতে পূর্ব্বে নামের আগে "শ্রীযুক্ত" লেখা হইত; মুসলমান-আমলে আসিলেন "বাবু"। যখন কোন ব্যক্তিকে যথেষ্টরূপ সম্মান দেখাইতে হইত, তখন তাঁহাকে লেখা হইত "শ্রীযুক্ত বাবু" তার পর ইংরাজী মতে আসিল "Mr." এবং "Esquire"। শেষোক্ত কারণে এখন Mr. বা Esqr.ই প্রযুক্ত হয়। হিন্দু "শ্রীযুক্ত" এবং মুসলমান "বাবু" বেশ একত্র মিলিয়া মিশিয়া ছিল; মিষ্টারও এমনি ভাবে মিশিয়া "শ্রীযুক্ত বাবু মিষ্টার অমুক চন্দ্র অমুক এস্কোয়ার" হইতে পারিত, কিন্তু ইংরাজেরা আসিয়াই "বাবু"কে অত্যন্ত অনাদর অবহেলা ও ঘৃণা করিতে লাগিলেন, তাই "বাবু" অভিমানে এখন গা-ঢাকা দিয়াছেন; বাবু অন্তর্হিত হইলেও অন্যান্য বিষয়ে বেশ ত্র্যহস্পর্শ ঘটিয়াছে। এখন ভাল ভোজ দিতে গেলে, হিন্দুমতে শাক্-শুক্তানী, মোগলাই মতে কালিয়া-পোলাও, এবং ইংরাজী মতে চপ্ কাট্‌লেট্‌এর আয়োজন করিতে হয়। পোষাকেও তাই—ধুতি, চাদর, চাপকান এবং মোজা ক'লার (Collar)। বর্ত্তমান বাঙ্গলা ভাষারও তাই—সংস্কৃত, বাংলা, ফার্সী, আর্‌বী এবং ইংরাজী সকলেই বাঙালীর ভাষায় কিছু না কিছু স্থান অধিকার করিয়া আছেন।"

এই সময়ে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় জ্যোতিবাবুদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। জ্যোতিবাবু মাইকেলের কথায় বলিলেন, "মাইকেল মধুসূদন দত্তমহাশয় তখন আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসিতেন। আমার ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ আলাপ-পরিচয় ছিল। মধুসূদনকে আমার



কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বেশ স্পষ্টই মনে পড়ে। রঙ ময়লা, চুলগুলি ইংরাজী-ফ্যাসানে ছাঁটা বেশ কোঁকড়া-কোঁকড়া, মাঝখানে সীঁথি। চোখ দু'টী বড় বড়, লোচন প্রতিভা-দীপ্ত, চেহারা দোহারা, মুখশ্রী অপূর্ব্ব লাবণ্য-সমুজ্জ্বল। তাঁহার গলার আওয়াজ ছিল একটু ভাঙা'-ভাঙা'। আমার মনে পড়ে, একদিন তিনি "মেঘনাদবধ" কাব্যের পাণ্ডুলিপি, তাঁহার সেই ভাঙ্গা-গলায় পড়িয়া সারদাবাবুকে শুনাইতেছিলেন। তখনও "মেঘনাদবধ" কাব্য প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার কবিতাপাঠের কায়দাই ছিল এক স্বতন্ত্র। প্রত্যেক কথাটি স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া, থামিয়া থামিয়া এবং পৃথক পৃথক করিয়া, একটানে বলিয়া যাইতেন, যথা "সম্মুখ—সমরে—পড়ি—বীর—চূড়া—মণি—বীর—বাহু—চলি—যবে—গেলা—যম—পুরে—অকালে—কহহে—দেবি—" ইত্যাদি। যেমন কবি বা যেমন কাব্য, তাঁহার কবিতার আবৃত্তি তেমন হইত না। সে আবৃত্তিতে কোন প্রকার ভাব-প্রকাশের চেষ্টা থাকিত না। তিনি অতিশয় সহৃদয়, আমুদে, এবং মজলিশি ব্যক্তি ছিলেন। গল্প করিয়া লোককে মুগ্ধ করিবারও তাঁহার শক্তি অপূর্ব্ব এবং অসাধারণ ছিল।

"মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় কিরূপ সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন তাহার একটা ঘটনা বলিতেছি। বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত নামে আমাদের একজন পরিচিত এবং অনুগত লোক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার টাকে হাত বুলাইতেন এবং ব্যবসা সম্বন্ধীয় নানাবিধ মৎলব আঁটিতেন। কিন্তু কোন ব্যবসায়েই তিনি লাভবান্ হইতে পারেন নাই। যে কাযেই তিনি হস্ত-ক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ দিকে তিনি একজন প্রকৃত কাব্যরসিক এবং রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। মাইকেলের নিকট হইতে "ব্রজাঙ্গনা" কাব্যের পাণ্ডুলিপি লইয়া পড়িয়া অবধি, তিনি মাইকেলের অতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়েন; "ব্রজাঙ্গনা" পড়িয়া

তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। মাইকেল তাহাই জানিতে পারিয়া—"ব্রজাঙ্গনা"র সমস্ত স্বত্ব (copy right) সেই পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই বৈকুণ্ঠবাবুকে দান করেন। বৈকুণ্ঠবাবু নিজব্যয়ে কাব্যখানি প্রথম প্রকাশ করেন।"



৺গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছেলেখেলা, নাটক-রচনা ও অভিনয়

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শৈশবসঙ্গী আর একজন ছিলেন, তিনি ৺গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গুণেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে জ্যোতিবাবু বলিলেন যে—"গুণুদাদা ও আমি প্রায়ই একবয়সী। আমরা ছেলেবেলায় বরাবর একত্রে থাকিতাম, একসঙ্গে খেলাধূলা এবং একসঙ্গে পাঠাভ্যাসও করিতাম। তিনি অত্যন্ত পরদুঃখকাতর, স্নেহশীল এবং উদারহৃদয় লোক ছিলেন। আমরা দুইজনে যেন হরিহর-আত্মা ছিলাম। এক হাতার মধ্যে আমাদের দুই বাড়ী। "এ-বাড়ী" আর "ও-বাড়ী"। তিনি রোজ সকালে আমাদের বাড়ী আসিতেন। আরও দুই চারি জন সঙ্গী জুটাইয়া লইয়া, আমাদের বাড়ীর বারাণ্ডায় আমরা সারাদিনই প্রায় আড্ডা বসাইতাম। গুণুদাদা বড় বড় কল্পনায় বড় আমোদ পাইতেন। কত রকম কল্পনা যে আমাদের মাথায় আসিত, তাহার আর ইয়ত্তা নাই; কিন্তু অধিকাংশ গল্পেই উবিয়া যাইত, কাযে কিছুই পরিণত হইত না। তবুও ওরই মধ্যে আমি একটু 'কেযো' ছিলাম, কল্পনাকে জুড়াইতে না দিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইতাম। তা' সে ছেলেমানুষীই হউক্ আর যাই হউক। গুণুদাদার তিন পুত্র —গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র ও অবনীন্দ্রনাথ।

"একদিন কথা হইল, আমাদের ভিতর Extravaganza নাট্য নাই। আমি তখনই Extravaganza প্রস্তুত করিবার ভার লইলাম। পুরাতন "সংবাদ-প্রভাকর" হইতে কতকগুলি মজার-মজার কবিতা জোড়াতাড়া দিয়া একটা "অদ্ভুতনাট্য" খাড়া করিয়া, তাহাতে সুর বসাইয়া ও-বাড়ীর

বৈঠকখানায় মহাউৎসাহের সহিত তাহার মহলা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে একটা গান ছিল,—

"ও কথা আর ব'লোনা, আর ব'লোনা,
বল্‌ছো বঁধু কিসের ঝোঁকে—
ও বড় হাসির কথা, হাসির কথা,
হাসবে লোকে, হাস্‌বে লোকে—
হাঃ হাঃ হাঃ হাস্‌বে লোকে!—"

হাঃ হাঃ হাঃ—এই জায়গাটাতে সুর হাসির অনুকরণে রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। বৈঠকখানায় ঐরূপ "হাঃ হাঃ হাঃ" সুরে অধিকাংশ সময়ে অট্টহাস্য হইত আর ধূপধাপ্ শব্দে প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য চলিত। শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্মৃতিকথায় এই "অদ্ভুতনাট্য" বড় দাদার নামে আরোপ করিয়াছেন; কিন্তু বড়দাদা (শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) এই শান্তিহানির বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

"একদিন আমাদের বারাণ্ডার আড্ডায় কথা উঠিল—সেকালে কেমন "বসন্ত-উৎসব" হইত। আমি বলিলাম—'এসোনা, আমরাও একদিন সেকেলে ধরণে বসন্ত-উৎসব করি।' অমনি গুণুদাদার কল্পনা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। একদিন এক বসন্ত-সন্ধ্যায় সমস্ত উদ্যান বিবিধ রঙীন্ আলোকে আলোকিত হইয়া নন্দনকাননে পরিণত হইয়া উঠিল। পিচ্‌কারী আবীর কুঙ্কুম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম উপস্থিত হইয়া গেল। খুব আবীরখেলা হইতে লাগিল। তারপর গান বাজনা আমোদ প্রমোদও কিছুমাত্র বাদ গেল না। ইহাতে অনেকগুলি টাকাও খরচ হইয়া গেল।

"আর একদিন আমাদের বারাণ্ডার আড্ডায় কথা উঠিল—আমাদের মধ্যে Free mason এর মত একটা কিছু করিলে হয় না? এ কল্পনাটা

গুণদাদার খুব ভাল লাগিল। এ প্রস্তাবটি তিনি আন্তরিক অনুমোদন করিলেন। আমি বলিলাম—এখনি ইহার উদ্যোগ আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাউক্। দেশী masonic দলের কিরূপ পরিচ্ছদ হইবে, প্রথমে ইহাই হইল আমাদের প্রধান সমস্যা। যাহা হউক, অনেক প্রকার যুক্তিতর্ক বাদ প্রতিবাদ করিয়া একটা পোষাক স্থির হইল। দরজী আসিল, কিরূপ কাপড় ব্যবহৃত হইবে, তখনই তাহার পরামর্শ বসিয়া গেল।

"ও-বাড়ীর সংলগ্ন একটা ছোট বাড়ী আমাদের নূতন কেনা হইয়াছিল, সেই বাড়ীতে Free mason-এর আড্ডা বসিল। Free mason সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা কিছুই ছিল না। এ সভায় আমাদের যে কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহারও কিছুই স্থির নাই। এই মাত্র জানিতাম যে, আমাদের যাহা কিছু করিতে হইবে সমস্তই গোপনে করিতে হইবে। একটা "প্রতিজ্ঞা-পত্র" লিপিবদ্ধ হইল। তাহার মর্ম্ম কতকটা এইরূপ :—এখানে আমরা যাহা শুনিব, যাহা দেখিব বা যাহা করিব, তাহার বিন্দুমাত্রও বাহিরে কাহারও নিকটে প্রকাশ করিব না—প্রাণান্তেও না। সে যেন হইল, কিন্তু ঘরের পরিচারক ভৃত্য বুদ্ধু বেহারার সম্বন্ধে কি করা যাইবে? স্থির হইল, আমাদের অন্যতম mason ভ্রাতা অক্ষয়বাবু (প্রসিদ্ধ "কমিক" অভিনেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার)—হিন্দিভাষায় বুদ্ধুকে এই প্রতিজ্ঞার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবেন। তিনি অমনি বুদ্ধুকে বুঝাইতে লাগিলেন—"দেখো বুদ্ধু, হিঁয়া তোম্ যো কুছ্ দেখো গে, কভি কিসিকো নেই বোল্না—আচ্ছা?" ইত্যাদি। বুদ্ধু একথা শুনিয়া, কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে বলিয়া উঠিল—"হম্ কেন বল্‌বে মশাই?" সংক্ষেপে এই কয়টি কথা বলিয়াই সে ঘরের ঝাড়পোঁচ কার্য্যে পুনঃপ্রবৃত্ত হইল।

ফ্রিমেশানি পালার এইখানেই ইতি হইল। সৌভাগ্য ক্রমে আর বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই।"

এইখানে জ্যোতিবাবু, গুণেন্দ্রনাথের দয়া ও আশ্রিত-বাৎসল্যের একটা গল্প বলিলেন। "আমাদের একজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ঋণগ্রস্ত হইয়া গুণুদাদার বাড়ীতে আশ্রয়-গ্রহণ করেন। তিনি সেইখানেই অবস্থিতি করিতেন। পাওনাদার তাঁহার উপর ওয়ারেণ্ট জারী করিবার সুযোগ পাইত না। জনৈক গৃহশত্রু বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দ্বিপ্রহর রাত্রে তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়। গুণুদাদা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমাদের এ-বাড়ীতে আসিয়া আমাকে জাগাইলেন এবং এই বিপদের কথা জানাইলেন। ব্যাঙ্ক বন্ধ—এত রাত্রে—অত টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে? আমার তখন হাটখোলায় পাটের আড়ৎ ছিল—লোক পাঠাইয়া সেখান হইতে তখনি টাকা আনাইলাম—তিনি সেই টাকায় ঋণ-পরিশোধ করিয়া, তৎক্ষণাৎ ঐ বিপন্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিলেন।"

মধ্যে একবার জোড়াসাঁকো-বাড়ীর আগাগোড়া মেরামৎ ও জীর্ণ-সংস্কার করিবার প্রয়োজন হয়। সেই উপলক্ষ্যে নৈনানে শ্রীযুক্ত মতিলাল শীল মহাশয়ের বাগান বাড়ীটি ভাড়া লইয়া, বাড়ীশুদ্ধ সকলে কিছুদিন সেখানে বাস করিতেছিলেন। বাড়ীটি খুব বড়, দোতালা, বাড়ীর হাতাও ছিল খুব বিস্তৃত। হাতার মধ্যেই খানিক দূরে রান্না-বাড়ী। রান্না-বাড়ীটি বড় বড় গাছে ঘেরা, তাহার সামনে ঘাট-বাঁধান' একটা পুষ্করিণী। চাকরেরা রাত্রি ১১টা ১২টার সময় রান্নাঘরের সম্মুখ দিয়া যদি যায় তো,অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। শেষে এমন হইল যে, একদিন একটা চাকর, অত্যধিক ভয়ে মরিয়াই গেল। কিনু নামে একজন বৃদ্ধ হর্‌করা ছিল। জ্যোতিবাবু কিনুকে ডাকিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিল—"দাওয়ানজীর (মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়) মত চেহারা, মাথায় তাঁরই

মত পাগ্‌ড়ী কে একজন রোজ রাত্রে রান্নাঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকে।" এই কথা শুনিয়া জ্যোতিবাবু ভূতের অস্তিত্বনির্ণয়ে বিশেষ কৌতূহলী হইয়া পড়িলেন। বাল্যকালেও তিনি ভূত বিশ্বাস করিতেন না, এজন্য তিনি মনে মনে একটা গর্ব্ব অনুভব করিতেন। যাহাই হউক, এক্ষেত্রে তিনি ভূত-আবিষ্কার ব্যাপারে নিজেই ব্রতী হইলেন। একদিন রাত্রি ১২টার পর একাকী রান্নাঘরের দিকে গেলেন। যেমন রান্নাঘরের নিকটবর্ত্তী হইলেন, অম্‌নি দেখিতে পাইলেন সত্য-সত্যই কে একজন পাগ্‌ড়ী মাথায় দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভয় তাঁহার যথেষ্টই হইয়াছিল, কিন্তু গর্ব্ব তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া অগ্রসর করিয়া দিল। নিকটতর হইয়া যাহা দেখিলেন তাহা নিতান্তই হাস্যকর। দেওয়ালের একটা জায়গায় খানিকটা চুন-বালি খসিয়া গিয়া স্থানে স্থানে কালো এবং সাদা সাদা রেখাপাত হইয়া সমস্তটা দূর হইতে একটা পাগড়ী-পরা মূর্ত্তির মত দেখাইতেছিল। চাকর বাকরেরা ইহাকেই ভূত কল্পনা করিয়া এত ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। জ্যোতিবাবু তখন সকলকে তাহা প্রত্যক্ষ করাইয়া দিলেন ;—সেই হইতে ভূতের ভয়ে আর কেহ মরা দূরে থাকুক, মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত যায় নাই।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও একটি মজার গল্প বলিলেন। সেকালে জ্যোতিবাবুদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ইঁহাদের বন্ধু-বান্ধবগণ অথবা অনেক বন্ধুপুত্রেরা থাকিয়া কলিকাতার স্কুল কলেজে লেখাপড়া করিতেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ও ইঁহাদের বাড়ীতে থাকিয়া কলিকাতায় পড়িয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রসিকলাল পাইন্ নামে তখন একজন ছাত্র ইঁহাদের বাটীতে থাকিতেন। জ্যোতিবাবু একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে, তিনি যেন রসিক বাবুদের বাড়ী গিয়াছিলেন, এবং দেখিয়া আসিয়াছেন যে, তাঁহাদের বাড়ী ঘেঁসিয়া একটা আতাগাছ উঠিয়াছে ; কখনকখনও আতা

শুকাইয়া তাঁহাদের ছাদের উপর পড়ে। রসিক বাবুকে এ স্বপ্নের কথা বলায়, তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি করে জান্‌লে?" জ্যোতিবাবু একথা তাঁহার বড়দাদাকে (দ্বিজেন্দ্রনাথ) বলেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু আবার এই কথা প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়কে বলেন। প্যারীবাবু তখন খুব spiritualismএর অনুশীলন করিতেছিলেন। তাঁহার মতে আত্মা শরীর ছাড়িয়া বাহির হইয়া কখনকখনও অন্যত্র যায়। এই স্বপ্নবৃত্তান্তটি তিনি তাঁহার মতের পোষক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয় সম্বন্ধে জ্যোতিবাবু আরও যে দুই একটা কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও এইখানে বলিয়া রাখিতেছি।—"আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তিনি যে ঘরটিতে থাকিতেন, সেই ঘরটি (তিনি চলিয়া যাওয়ার পরও) অনেক দিন পর্য্যন্ত "মনমোহনের ঘর" বলিয়া অভিহিত হইত। সকালে দেখিতাম, একটা ধুতি পরিয়া ও গায়ে একটা গুলবাহার চাদর জড়াইয়া তিনি পাঠাভ্যাস করিতেছেন। কখন কখন দেখিতাম, বারাণ্ডায় বেড়াইতে বেড়াইতে, এক জায়গায় থমকিয়া দাঁড়াইয়া মস্তক উন্নত করিয়া, পকেটে দুই হাত ভরিয়া, ভাবে বিভোর হইয়া তিনি অস্ফুটস্বরে সেক্‌স্‌পিয়ার আবৃত্তি করিতেছেন। একটা আবৃত্তির দুই একটা কথা এখনও আমার মনে পড়ে—যথা—"Nor poppy nor Mandagora" ইত্যাদি। এই কথাগুলি তিনি কতকটা সংস্কৃতছন্দের টানে পড়িতেন;—"নর্‌" এই শব্দটির র্‌-কে অকারান্ত করিয়া "নর" এইরূপ পড়িতেন, এবং সমস্তটা একটু টান্‌ দিয়া বলিতেন—"নরপপী নরম্যান্‌ ডাগোরা"—আমার শুনিতে বেশ লাগিত। তখন হইতেই আমাদের রাষ্ট্রিক উন্নতিসাধনের দিকে তাঁহার প্রবল ঝোঁক্‌ ছিল, এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি পিতৃদেবের অর্থসাহায্যে "ইণ্ডিয়ান মিরার" নামক একখানি ইংরাজি



৺মনোমোহন ঘোষ (পাঠদ্দশায়).

সংবাদপত্র বাহির করেন। মনোমোহনই তাহার প্রথম সম্পাদক হয়েন। তখন হইতেই তিনি চমৎকার ইংরাজি লিখিতে পারিতেন। এই সময়ে Captain Palmer নামক একজন সুলেখক ইংরাজ জুটিয়া গিয়াছিল। তাঁহাকে পারিশ্রমিক দিয়া ইণ্ডিয়ান মিরারে লেখান হইত। তিনিই সমস্ত লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন। দোষের মধ্যে লোকটি বড় মাতাল ছিলেন। যাহা কিছু পাইতেন, সমস্তই মদে উড়াইয়া দিতেন। আমার বেশ মনে আছে, পামার সাহেব একদিন মদের পয়সা সংগ্রহ করিবার জন্য খুব অল্প দামে, মাথায় দূর্‌বীণ্‌ বসানো একগাছি ভাল ছড়ি সেজদাদাকে বিক্রয় করিয়া ছিলেন।”

পাঠ-শেষ

নানা স্কুল-পরিবর্ত্তন করিয়া, শেষে হিন্দুস্কুল হইতে জ্যোতিবাবু কেশববাবুর স্থাপিত "কলিকাতা কলেজে" ভর্ত্তি হয়েন। কেশব-বাবুর ইচ্ছা ছিল এই বিদ্যালয়টিকে তিনি কলেজে পরিণত করিবেন, তাই পূর্ব্ব হইতেই Calcutta College নাম রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। যাহাই হউক্, এ স্কুলে তখনকার সব কৃতবিদ্য মনীষীরা অবৈতনিকভাবে শিক্ষকতা করিতেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র, প্রতাপ মজুমদার, উকীল ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায় (উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় W C Bonnerjee মহাশয়ের পিতৃব্য), স্যর তারকনাথ পালিত প্রভৃতি অনেকেই এই স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। কেশববাবু কেবল নীতি উপদেশ দিতেন। বোর্ডে নানা-রূপ চিত্র বৃত্ত ও শাখা প্রশাখা সমন্বিত বৃক্ষ আঁকিয়া ঈশ্বরের প্রতি, মানুষের প্রতি, আপনার প্রতি, মানুষের নানাপ্রকার কর্ত্তব্যবিভাগ বুঝাইয়া দিতেন; আর নৈতিক উৎকর্ষসাধনের জন্য নানা-বিধ বক্তৃতাও দিতেন। তাঁহার সচিত্র উপদেশ ছাত্রদিগের খুবই হৃদয়গ্রাহী হইত।

ক্লাস বসিবার আগে, সমস্ত ছাত্রেরা একটি ঘরে সমবেত হইত। যে শিক্ষক আগে আসিতেন, তিনি ছাত্রদিগকে বাইবেল-উক্ত Lord's Prayerটি বলাইতেন:—

Our father, which art in Heaven
Hallowed be Thy name.

Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in Heaven.

Give us this day our daily bread.

And forgive us our debts, as we forgive our debtors.

And lead us not into temptation, but deliver us frcm evil ; ior Thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever·

Amen,

বঙ্গানুবাদ—হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হউক্। তোমার রাজ্য প্রবর্ত্তিত হউক। তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন, পৃথিবীতেও তেমনি পূর্ণ হউক। আমাদিগকে আজ আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য দাও। আর, আমরা যেমন আপন আপন অপরাধী-দিগকে ক্ষমা করিয়াছি, তেমনি তুমিও আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা কর। আর আমাদিগকে প্রলোভনের দিকে লইয়া যাইও না, আমাদিগকে মন্দ হইতে রক্ষা কর। যেহেতু রাজ্য, শক্তি, এবং মহিমা নিত্যকাল তোমারই। আমেন্।

জ্যোতিবাবু বলিলেন, 'আশ্চর্য্যের বিষয় 'ওঁ পিতা নোঽসি' মন্ত্রটির* সহিত এই Lord's Prayerএর একটু মিল আছে ; কিন্তু আমাদের

* "ওঁ পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি, নমস্তেঽস্তু। মা মা হিংসীঃ। বিশ্বানি দেব সবিতদুৃরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব। নমঃ সম্ভবায় চ ময়ো ভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।"

বঙ্গানুবাদ—তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দাও, তোমাকে নমস্কার। আমাকে মোহপাশ হইতে রক্ষা কর, আমাকে পরিত্যাগ

বেদমন্ত্র, উক্ত Prayerটি হইতে কত উন্নততর এবং গভীর ভাব-ব্যঞ্জক! ইংরাজী প্রার্থনায় আছে 'Daily bread দাও', আর বৈদিক ঋষিরা প্রার্থনা করিয়াছেন "জ্ঞানশিক্ষা দাও"। কেশববাবুদের বোধ হয় হিন্দু উপনিষদ্ ও বেদের উপর ততটা আস্থা ছিল না, অথবা অনুশীলনের অভাবের ফলেই, এই সুন্দর প্রার্থনাটি তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়াছিল।"

এই Calcutta College হইতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। পরীক্ষার শেষ দিনে, যেদিন ইতিহাস ও ভূগোলের পরীক্ষা হইতেছিল সেদিন, একটা ভারি মজার ঘটনা ঘটিয়াছিল। যখন ঘণ্টা বাজিল, তখনও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উত্তর লিখিতেছিলেন। এমন সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল Sutcliff সাহেব পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া, কাগজগুলি তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া, একেবারে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তখন আরও কয়েকটি ছেলেও লিখিতেছিল, ঘণ্টা বাজিয়া সবে এক মিনিটও হয় নাই, তবু তাঁহার নিকট হইতে কাগজ কাড়িয়া লইয়া কেন যে সাহেব ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, বুঝিতে না পারিয়া তিনি একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন। জ্যোতিবাবু বলিলেন যে, "হিন্দুস্কুলের ছেলেদিগ্‌কে তিনি যে পরিমাণ অনুগ্রহ করিতেন, অন্য স্কুলের ছেলেদের উপর সেই পরিমাণ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইতেন। অথবা পাহারা দিয়া দিয়া তাঁহার পিত্ত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল—আমাকে প্রথমে সম্মুখে পাইয়া, আমার উপরেই বেশ করিয়া ঝালটা ঝাড়িয়া লইলেন। কারণ আমি ছিলাম Calcutta Collegeএর ছাত্র। যাহাই হউক, পাশ হওয়ার বিষয়ে আমি একেবারে নিরাশ হইলাম।"

করিও না, আমাকে বিনাশ করিও না। হে দেব, হে পিতা, সকল পাপ মার্জ্জনা কর। যাহা কল্যাণ তাহা আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর। তুমি যে সুখকর, কল্যাণকর, সুখ কল্যাণের আকর, কল্যাণ ও কল্যাণতর, তোমায় নমস্কার।

একদিন তিনি বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, পথিমধ্যে তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহাকে জানাইল, যে তিনি পাশ হইয়াছেন। তিনি তো শুনিয়া অবাক্, বিশ্বাসই করিলেন না। কিন্তু শেষে জানিলেন যে, সত্য সত্যই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ হওয়ার পর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। জ্যোতিবাবু প্রথমবার্ষিক শ্রেণীর A. Sectionএ পড়িতেন, B. Sectionএ তখন পড়িতেন, বিহারীলাল গুপ্ত এবং রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়েরা। Rees সাহেব গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি চাটগাঁয়ের ফিরিঙ্গি, সেই জন্য তাঁহার ইংরাজিতেও পূর্ব্ববঙ্গের টান ছিল। বাস্তবিক তিনি গণিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার গর্ব্বটা ছিল ততোধিক। কোনও একটা দুরূহ গণিত-সমস্যার সমাধান করিয়াই তিনি বলিতেন, এরূপ ভাবে সমাধান আর কেহই করিতে পারিবে না—এমন কি "The man of upstairs" অর্থাৎ উপরিওয়ালা Sutcliff সাহেবও পারিবেন না। তিনি কাহাকেও বড় প্রশংসা করিতেন না—কেবল একবার জ্যোতিবাবুর বড়দাদার (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছিলেন। সে তাঁহার ভাগ্যই বলিতে হইবে। দ্বিজেন্দ্রবাবু সেই সময়ে নূতন প্রণালীতে একখানি জ্যামিতি ছাপাইয়াছিলেন। ছাত্রেরা মজা দেখিবার জন্য তাঁহার হস্তে সেই বই একখণ্ড দিল—তিনি খানিকটা পড়িয়া বলিলেন, "This man has brains".

তিনি মদে চূর হইয়া ক্লাসে পড়াইতে আসিতেন। তাঁহার মুখের কাছে অনবরত মাছি ভন্‌ভন্ করিত, আর তিনি ক্রমাগত হাত দিয়া তাড়াইতেন। তিনি পূর্ব্বাঞ্চলের ছাত্র দেখিলেই, তাহাকে নাকাল করিয়া ছাড়িতেন, কিন্তু সহুরে ছাত্রকে বড় কিছু বলিতেন না।

৺ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন

সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবু যখন পড়াইতে আসিতেন, তখন ক্লাসে মহা হট্টগোল আরম্ভ হইত। কিন্তু কৃষ্ণকমল বাবুর সময়ে ক্লাসে কাহারও টুঁ-শব্দটি পর্য্যন্ত শোনা যাইত না,—এমনি তাঁহার একটা গাম্ভীর্য্য ও চরিত্রপ্রভাব ছিল। ছাত্রেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতেই পারিত না। Lt. Ives ইংরাজী পড়াইতেন। Ives সাহেবের গলা খুব উচ্চ ছিল ; যখন তিনি পড়াইতেন তখন সমস্ত হল্‌খানি তাঁহার কণ্ঠস্বরে কাঁপিতে থাকিত। একদিন কি একখানি বইয়ে Mont Blanc কথাটি পাওয়া যায়। Ives সাহেব একে একে সমস্ত ছাত্রকে উক্ত বাক্যের শুদ্ধ উচ্চারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সকলেই বলিল, "মণ্টব্ল্যাঙ্ক" ; শেষে জ্যোতিবাবুকে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বলিলেন "মঁ ব্লাঁ",—শুনিয়াই সাহেব খুব প্রীত হইলেন—এবং জ্যোতিবাবু যে ফরাসী ভাষা জানেন, সাহেবের এ ধারণা জন্মিয়া গেল। কিন্তু জ্যোতিবাবু তখন পর্য্যন্ত ফরাসীর এক বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। তবে তিনি কি করিয়া এ উচ্চারণ জানিলেন ? তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন, "মেজদাদা (সত্যেন্দ্রনাথ) তখন নূতন বিলাত হইতে আসিয়াছেন ; তাঁহার নিকট বিলাতের গল্প শুনিতে শুনিতে ঐ কথাটির প্রকৃত উচ্চারণটি একদিন শুনিয়াছিলাম—তাহাই আমার মনে ছিল।" যাহাই হউক, জ্যোতিবাবুর ক্লাসে একটা খুব প্রতিপত্তি হইয়া গেল। Ives সাহেবও জ্যোতিবাবুর উপর খুব একটা ভাল ধারণা করিয়া রাখিলেন। তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে রীতিমত শিক্ষা দিবার জন্য, কত দিন তাঁহার বাড়ীতে যাইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু যাওয়া তাঁহার আর হইয়া উঠে নাই।

Ives সাহেবের বাড়ী গিয়া পড়া ত' দূরের কথা, ক্লাসেই তিনি নিয়মিতরূপে যাইতেন না, যদি বা যাইতেন ত' পলাইয়া আসিতেন।

তখন গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নীচের একটা ঘরে ইঁহাদের আড্ডা



৺মনোমোহন ঘোষ—ব্যারিষ্টার

বসিত, সেখানে গান বাজনা গল্পগুজব খুব পুরাপুরিই চলিত। First Year এমনি করিয়া গান বাজনা প্রভৃতিতে দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। Second Yearও প্রায় যায়-যায়। পরীক্ষার সময় যখন খুব নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, তখন তিনি খুব মনোযোগ দিয়া পড়া আরম্ভ করিয়া দিলেন।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সিভিলিয়ান হইয়া এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয় ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিয়া, কাশীপুর বাগানবাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও আসিয়া, এই খানে ইঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা ক্রমশঃ তাঁহার শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। পরীক্ষার পড়া ছাড়িয়া, তিনি মিষ্টার ঘোষের নিকট ফরাসী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিয়া দিলেন। যাঁহার অক্লান্ত লেখনী বার্দ্ধক্য-জরার বজ্রমুষ্টিকে অবহেলা করিয়া, আজিও ফরাসী ভাষা হইতে নিত্য নূতন অমূল্যরত্নরাজি আনিয়া বঙ্গভারতীর সাহিত্য-মঞ্জুষা পরিপূর্ণ করিতেছে, সেই ফরাসী ভাষায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম শিক্ষারম্ভ হইল, এই কাশীপুর উদ্যানবাটিকায়। মনোমোহন ঘোষ মহাশয় প্রথমেই ভল্টেয়ার কৃত "সীজার" (Cæsar) নাটক তাঁহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, তাহার প্রথম চরণের একটু অংশ এখনও তাঁহার কর্ণে যেন অহরহ ধ্বনিত হইতেছে :—

"Cæsar tu vas regnier"—সীজার তু ভা রেঞিয়ে ; অর্থাৎ —সীজার তুমি রাজত্ব করিতে যাইতেছ—ইত্যাদি।

এইখানে অবস্থানকালে, অবকাশ সময়ে জ্যোতিবাবু তাঁহার মেজ-বৌ-ঠাকুরাণীর নিকট বোম্বায়ের অনেক গল্প শুনিতেন। বোম্বায়ের গল্প সমুদ্র ও দৃশ্যাবলীর কথা শুনিতে শুনিতে, বোম্বায়ের প্রতি তিনি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। অবশেষে পরীক্ষা না দিয়া বোম্বাই যাইতেই

সংকল্প করিলেন। পরীক্ষা দিবেন না, কাযেই ফীও দাখিল করা হইল না। বোম্বাই যাত্রার সমস্ত ঠিক হইয়া গেল। ইতিমধ্যে পালিত মহাশয় (স্যর টি পালিত) তথায় গিয়া উপস্থিত। তিনি তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধরণে থান্ ধূতি পরিতেন, এবং আপাদ-লম্বিত একখানি মোটা চাদর গায়ে জড়াইতেন। সে পরিচ্ছদে বেশ একটা অপূর্ব্ব শোভা এবং মধুর গাম্ভীর্য্য ছিল। আর এই বেশে তাঁহাকে হঠাৎ একজন সম্ভ্রান্ত রোমক সেনেটার বলিয়া ভ্রম হইত। এইবার হয়ত পড়াশুনার সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে আশঙ্কা করিয়া, স্যর পালিতকে দেখিবামাত্রই জ্যোতিবাবু বিষম ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। পালিত মহাশয় জ্যোতিবাবুকে বরাবর ছোট ভাইয়ের মতই স্নেহ করিতেন—তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমস্ত মৎলব শুনিয়া,তাঁহাকে পরীক্ষা দিবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন। ফী পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই শুনিয়া, তিনি বলিলেন, "সেজন্য তোমার কোনও চিন্তা নাই, আমি Sutcliff কে বলিয়া, তোমার ফী জমা করাইয়া দিব। তুমি শুধু পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হও।" জ্যোতি-বাবু মহা মুস্কিলে পড়িলেন, কিন্তু শেষে তাঁহারই জিত হইল। তিনি পরীক্ষা না দিয়াই, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বোম্বাই পলায়ন করিলেন।

বোম্বাই-গমন, সঙ্গীত-শিক্ষা এবং নাট্যসাহিত্যের সংস্কার

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিদ্যালয় ছাড়িলেন, কিন্তু বিদ্যাচর্চ্চা ছাড়িলেন না; বরং দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। বোম্বাই গিয়াই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনেকগুলি ভাল ভাল ইংরাজি এবং সংস্কৃত গ্রন্থ কিনিয়া ফেলিলেন, এবং অধিকাংশ সময় ঐ সমস্ত পুস্তকপাঠেই নিযুক্ত থাকিতেন। এখানে অবস্থান কালে, তিনি আরও একটি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন—সেটি সেতার-বাদ্য। একজন গুজ্‌রাটী মুসলমান তাঁহাকে প্রত্যহ সেতার শিখাইত। ক্রমশঃ ওস্তাদজীর জানা সমস্ত গৎই অভ্যাস করিয়া লইয়া, অত্যল্পকালের মধ্যেই তিনি গুরুর সমস্ত পুঁজিপাটা প্রায় নিঃশেষ করিয়া দিলেন। যাহাই হউক, এই ওস্তাদের কাছেই সর্ব্বপ্রথম তিনি সেতারে সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

বোম্বাই হইতে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার সেতার বাজনা শুনিয়া বাড়ীর সকলেই চমৎকৃত হইলেন। বিশেষত গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, তাঁহার সেতার বাজনায় এমনি মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি জ্যোতিবাবুকে (ostrich) সাত্রোক্ পক্ষীর ডিমের তুম্বে একটি সুন্দর সেতার তৈরি করাইয়া, তাঁহাকে সস্নেহে উপহার দিয়াছিলেন। জ্যোতিবাবু এই সেতারটি তাঁহাদের বাড়ীর একটা আল্‌মারির উপর রাখিয়া দিয়াছিলেন, বহু দিন সেটি ছিল, কিন্তু কি করিয়া পড়িয়া গিয়া পরে সেটি ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি বলিলেন, অভ্যাসের অভাবে এক্ষণে তাঁহার সেতারের হাত আর আদপেই নাই।

পর পৃষ্ঠায় তাঁহার কথাই উদ্ধৃত করিতেছি :—

"সে সময়ে সেতারের খুব রেওয়াজ ছিল। সৌখীন যুবকেরা প্রায়ই তখন ঐ যন্ত্রই শিক্ষা করিত। আমার ভগিনীপতি ৺ সারদা-প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় তখন জুয়ালাপ্রসাদ নামক একজন প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী ওস্তাদের নিকট সেতার শিখিতেন। তিনি যে সকল গৎ শিখিয়াছিলেন তাহা লক্ষ্ণৌ ঢং-এর। ওস্তাদ্‌জী আমার শিক্ষিত গৎগুলি শুনিয়া বলিলেন—এগুলি দিল্লী ঢং-এর। দিল্লী ঢং-এর গৎগুলি একটু বেশী সাদাসিধা। তখন সারদাবাবুর বৈঠকখানাতে প্রায়ই প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গায়ক বাদক প্রভৃতি গুণীগণের মজলিস বসিত। সারদাবাবু একজন সৌখীন লোক ছিলেন। তিনি নিজেও বেশ ধ্রুপদ গাহিতে পারিতেন।"

দ্বিজেন্দ্রবাবুর পুরাণো কোন-রকমে কাযচলা একটা পিয়ানো ছিল। দ্বিজেন্দ্রবাবু যখন ঘরে থাকিতেন না, জ্যোতিবাবু তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া সেই পিয়ানোটি বাজাইতেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু দেখিতে পাইলেই "ভেঙ্গে যাবে, ভেঙ্গে যাবে" বলিয়া ধমক দিয়া উঠাইয়া দিতেন, কিন্তু জ্যোতিবাবু তবুও সেই পিয়ানো বাজাইবার প্রলোভনটি কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না। যাহাই হউক, এমনই ভাবে একটু একটু করিয়া বাজাইয়া বাজাইয়া, পিয়ানোতেও তাঁহার একটু হাত জমিয়া গেল।

ইহাঁদের বাড়ীতে একটা খুব বড় টেবিল হার্ম্মোনিয়ম্ ছিল। অবসর মত জ্যোতিবাবু সেটির উপরেও সাক্‌রেদী চালাইতেন। ক্রমে হার্ম্মোনিয়মেও তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তি জন্মিল।

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটা খুব বড় টেবিল হার্ম্মোনিয়ম আসিল। তখন এ দেশে এই যন্ত্রটা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে একবারেই চলিত হয় নাই। সমাজে তখন গানের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ সেই যন্ত্রটি বাজাইতেন। পরে দ্বিজেন্দ্রবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু যখন



শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (যৌবনে)

ছাড়িয়া দিলেন, তখন হার্ম্মোনিয়ম্ বাজান' জ্যোতিবাবুর একটা প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল। সমাজে তখন স্বর্গীয় বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী মহাশয় গান করিতেন। ইঁহাদের বাড়ীতে বোম্বাই অঞ্চলের বিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সও কিছুদিন গায়ক ছিলেন। জ্যোতিবাবু ইঁহাদের দুইজনের গানের সঙ্গেই হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতেন। এইরূপে ভাল গায়কের সঙ্গে বাজাইতে বাজাইতে, তাঁহার হার্ম্মোনিয়মে হাত বেশ পাকিয়া উঠিল। সকলেই তখন ইঁহার হার্ম্মোনিয়ম বাজনার খুব প্রশংসা করিতেন। জ্যোতিবাবু বলিলেন, "তখন হার্ম্মোনিয়মবাদক বলিয়া আমার খুব একটা নামডাকও ছিল। কিন্তু এখন এত ভাল ভাল হার্ম্মোনিয়ম্ বাজিয়ে হইয়াছেন যে, তাঁহাদের কাছে আমি কলিকা পাইবারও উপযুক্ত নই।"

ব্রাহ্মসমাজে এবং বাঙ্গলা গানের সঙ্গে হার্ম্মোনিয়ম বাজান', এই প্রথম সুরু হইল। তৎপূর্ব্বে অনেকেই এই যন্ত্রের সহিত অপরিচিত ছিলেন। জ্যোতিবাবু বলিলেন—

"আমার মনে পড়ে, একদিন রামতনু লাহিড়ী মহাশয় আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সদাসর্ব্বদাই একখানি নোট্‌বুক্ থাকিত; যাহা কিছু নূতন তাঁহার নজরে পড়িত, তাহাই সেই নোট্‌বুকে তিনি টুকিয়া রাখিতেন। সেই বৃদ্ধের জ্ঞানপিপাসা ছিল অপরিসীম! পিয়ানোর সহিত হার্ম্মোনিয়মের কি তফাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া, পিয়ানো বাজান' সহজ কি হার্ম্মোনিয়ম বাজান' সহজ, নানা প্রশ্নোত্তরের পর সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া, সমস্ত তথ্য তিনি তাঁহার নোট্‌বুকে টুকিয়া লই-লেন। তাঁহার আবার "good day" "bad day" ছিল। তিনি যখনই আমাদের বাড়ী আসিতেন, তখনি এক পেয়ালা করিয়া চা খাইতেন। জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে "উঃ"—"আঃ" করিতে করিতে যখন তিনি আসিতেন, তখনই জানিতাম যে সেদিনটি তাঁর "bad day"।

তবু এমনি তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা যে,জ্বরে কাতরাইতে কাতরাইতেও নূতন কিছু দেখিলেই তিনি প্রশ্ন করিতে ছাড়িতেন না,এবং যাহা কিছু জ্ঞানলাভ করিতেন, তখনি পকেট হইতে নোটবুকখানি বাহির করিয়া তাহাতে টুকিয়া রাখিতেন। তিনি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে বড় ভাল বাসিতেন। যখনই তিনি আসিতেন,বাড়ীর ছেলেমেয়েদিগকে কাছে ডাকিয়া, নানা রকম গল্প জুড়িয়া দিতেন। আমার সঙ্গে দেখা হইলেই, তিনি আমাকে বলিতেন,—"তোমার ঠাকুরদাদা ৺দ্বারিকানাথ ঠাকুর মেডিকাল কলেজ-স্থাপনের জন্য কত যে যত্ন ও সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা Medical Collegeএর Record খোঁজ করিলেই জানিতে পারিবে।"

জ্যোতিবাবু বলিলেন, "হার্ম্মোনিয়ম প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে, সমাজে বিষ্ণু-বাবুর গানের সঙ্গে মান্না নামে একজন হিন্দুস্থানী সারেঙ্গ বাজাইত। এই মান্নার মত নিপুণ সারেঙ্গী কলিকাতায় তখন আর কেহই ছিল না। পরে হার্ম্মোনিয়ম চলিত হইলে, ক্রমে ক্রমে সারেঙ্গ উঠিয়া গেল। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। হার্ম্মোনিয়ম যন্ত্রে হিন্দু রাগ-রাগিণী ঠিকমত বাজান' যে একরূপ অসম্ভব—ইহা সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝেন।

"মান্নার একটা অদ্ভুত সখ ছিল। বাড়ীতে সে সদা সর্ব্বদা মহাদেবের মত গায়ে সাপ জড়াইয়া বসিয়া থাকিত। সাপও সব যেমন তেমন নয়—কেউটে গোক্ষুরা প্রভৃতি বিষাক্ত সাপ। সাপগুলিকে গায়ে জড়াইবার আগে, সে তাহাদের বিষদাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া দিত। কিন্তু ভাঙ্গিয়া দিলেও নাকি আবার গজায়, তাই সর্পাঘাতেই অবশেষে তাহার মৃত্যু হয়।"

জ্যোতিবাবু আরও বলিলেন—

"মহাত্মা রামমোহন রায় মহাশয়ের আমল হইতেই, কৃষ্ণ ও বিষ্ণু

দুই ভাই সমাজের একমাত্র গায়ক ছিলেন। কৃষ্ণকে আমরা কখনও দেখি নাই—আমাদের সময়ে বিষ্ণুই গান করিতেন। অন্যান্য ওস্তাদদের গানের চেয়ে, বিষ্ণুর গানই সকলে বেশী পছন্দ করিত। বিষ্ণুর গানের একটা বিশেষত্ব ছিল। ওস্তাদেরা যেমন রাগিণীতে তান-অলঙ্কারেরই প্রাধান্য দেন, বিষ্ণু তেমন কিছু করিতেন না। তিনি অল্প-স্বল্প তান দিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে রাগিণীর মূল রূপটি বেশ ফুটিয়া উঠিত, গানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত না। ইহা ছাড়া, গানের কথার যে একটা মূল্য আছে, সেটিও বিষ্ণুর গানে পূর্ণ মাত্রায় রক্ষিত হইত। সকলেই গানের সুর এবং গৎ দুইই সহজে বুঝিতে পারিত। বিষ্ণু ধ্রুপদ খেয়ালই বেশী গাহিতেন। বিষ্ণুর এই হিন্দি গান ভাঙ্গিয়াই সত্যেন্দ্রনাথ ৺র্ব্ব প্রথম ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। এই সময়ে সত্যেন্দ্রনাথের গান লোকে খুব ভালবাসিত। তাঁহার রচনায় এমনি একটা সহজ কবিত্ব ছিল এবং সুরের সঙ্গে ভাবের এমনি একটা মাখামাখি ছিল যে, তাহা সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিত।”

তাহার পর সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাই চলিয়া গেলে, জ্যোতিবাবু, তাঁহার সেজ্‌দাদা (৺হেমেন্দ্রনাথ) ও বড় দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ) এই তিনজনে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতেন। এই বিষয়ে মহর্ষি তাঁহাদিগকে খুব উৎসাহ দিতেন।

তখন বড় বড় গায়কদিগকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়া হইত। জ্যোতিবাবুর তিনজনকে বেশ স্পষ্ট মনে আছে:—“রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার রাজচন্দ্র রায় এবং যদু ভট্ট। রমাপতি নিজে একজন ভাল গায়ক ত' ছিলেনই, উপরন্তু তিনি নিজেও অনেক ভাল ভাল গান রচনা করিয়াছিলেন। সে সমস্ত গান এখন আমাদের দেশে সুপরিচিত। তাঁহার গানের শেষে

"রমাপতি ভণে" বলিয়া ভণিতা থাকিত। যদু ভট্টও হিন্দি গান রচনা করিতেন। তাঁহার গানের সুর-বিন্যাসে যথেষ্ট নিপুণতা এবং একটা মৌলিকতা ছিল। ইহা ব্যতীত তিনি পাখোয়াজের অনেক নূতন নূতন উৎকৃষ্ট বোলও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আমি দেখিয়াছি, কলিকাতার তখনকার কোন কোন প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী তাঁহার নিকট বোল আদায় করিবার জন্য, সত্যসত্যই তাঁহার চরণে তৈল মর্দ্দন করিত।

"ইঁহাদের গান ভাঙ্গিয়া, তখন আমি এবং বড় দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ) অনেক ব্রহ্ম-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলাম। কি সৌখীন কি পেশাদার কোনও গায়কের কোনও গান ভাল লাগিলেই, অমনি সেটি টুকিয়া লইয়া, আমরা ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতে বসিতাম। এইরূপে ব্রহ্ম-সঙ্গীতে অনেক বড় বড় ওস্তাদী সুর ও তাল প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বাঙ্গলায় সঙ্গীতের উন্নতি এমনি করিয়াই হইয়াছে। ইহার পরেই শ্রীমান্ রবীন্দ্র-নাথের আমল। তাঁহার অসামান্য কবি-প্রতিভা এখন ব্রহ্ম-সঙ্গীতকে প্রায় পূর্ণতায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে। নানা সুর, নানা ভাব, নানা ছন্দ, নানা তাল, ব্রহ্ম-সঙ্গীতে আজ তাঁহারই দেওয়া। তাঁহার বীণা এখনও নীরব হয় নাই।"

তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সঙ্গীত-চর্চ্চাতেই অধিকাংশ সময় অতি-বাহিত করিতেন। নাটক অভিনয় করিবার দিকেও তাঁহার প্রবল ঝোঁক ছিল। অভিনয়ে তাঁহার গুণুদাদারও যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া, বাড়ীতেই একটি নাটকীয় দলের সৃষ্টি করিলেন। অভিনয়, তাহার আয়োজন, অভিনয়োপযোগী নাটকনির্ব্বাচন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য একটি সমিতি গঠিত হইল। সমিতির গৃহ হইল, তাঁহাদেরই ও-বাড়ীতে। সমিতির নাম হইল Committee of five। কৃষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিবাবু, অক্ষয়বাবু (চৌধুরী) এবং জ্যোতি-



কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ

বাবুর ভগিনীপতি ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এই পাঁচজনে এই নাট্য-সমিতির সভ্য হইলেন।

কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা। জ্যোতিবাবু পূর্ব্বে যখন কেশববাবুদের বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন, তখন হইতেই কৃষ্ণবিহারী বাবুর সঙ্গে তাঁহার আলাপ পরিচয়।

জ্যোতিবাবু বলিলেন—"কৃষ্ণবিহারী ইতিপূর্ব্বে "বিধবা-বিবাহ" নাটকে পড়ুয়ার পাঠ গ্রহণ করেন। তাই এই বিষয়ে তাঁহার একটু অভিজ্ঞতা থাকায়, আমরা তাঁহাকে ওস্তাদ বলিয়া মানিতাম। তিনিই আমাদের অভিনয়-শিক্ষক হইলেন।"

প্রথমেই মহাকবি মধুসূদনের "কৃষ্ণকুমারী" নাটক অভিনীত হইল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃষ্ণকুমারীর জননীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয় খুব ভালই হইয়াছিল। সকলেই অভিনেতা ও অভিনয়-পারিপাট্যের একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছিল। ইহাতে তাঁহাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়া উঠিল।

নীচের ঘরে অহোরাত্রই—হয় নাচ, নয় গান, নয় বাদ্য, নয় "পঞ্চজনে"র নাট্য-সমিতিতে বাদানুবাদ, কিছু-না-কিছুর একটা গোলমাল চলিতই। বাড়ীখানি সারাদিন হাস্যকলরবে ও গানবাদ্যে মুখরিত হইয়া থাকিত। মধ্যে মধ্যে বামাচরণ বলিয়া একজন যাত্রাদলের ছোক্‌রা আসিয়া, নাচগানে তাঁহাদের আমোদ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিত।

তাঁহাদের একটা "Eating Club" ও ছিল। সে ক্লবে পালা করিয়া একএকজনের খাওয়াইতে হইত। সে ভোজের তেমন বেশী কিছু আড়ম্বর ছিল না। লুচি কচুরি সন্দেশাদি খাইয়াই, সকলে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিত।

একতলার ঘরে, এইরূপ আমোদ ও রিহার্শ্যালের মাত্রা ক্রমশঃ এত অধিক চড়িয়া উঠিল যে, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি দোতলাবাসী অভিভাবক-গণ একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। ফলে রিহার্শ্যালের মাত্রা যদিও কিছু কমিয়াছিল, কিন্তু ভিতরের উদ্দীপনার কিছুমাত্র হ্রাস হইল না।

পরে মধুসূদনের আরও একখানি নাটক "একেই কি বলে সভ্যতা"রও অভিনয় হইয়া গেল। জ্যোতিবাবু সার্জ্জন সাজিয়াছিলেন। এ সব অভিনয়ের প্রধান শ্রোতার দল ছিল তখন—তাঁহাদেরই বাড়ীর লোক; ক্বচিৎ কখনও দুই একজন বাহিরের বন্ধুবান্ধবও নিমন্ত্রিত হইতেন।

বাড়ীর লোকে বরাবরই এ সমস্ত ছেলেখেলা ভাবিতেন। কিন্তু এখন বেশ দেখা যাইতেছে যে, এই ছেলেখেলার ভিতর দিয়াই কেমন নীরবে বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা দিক, দৃঢ় ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইঁহারা দেখিলেন, বাঙ্গলা সাহিত্যে অভিনয়োপযোগী নাটক মাত্র দুই তিনখানি। কিন্তু তাহাতে লোকশিক্ষার মত কোন জিনিষই নাই। আমোদের পরিসমাপ্তি আমোদে না হইয়া যাহাতে শিক্ষায় হয়, তজ্জন্য ইঁহারা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ Committee of five ইঁহাদের, ভূতপূর্ব্ব "স্যার", গৃহশিক্ষক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীর নিকট গিয়া, তাঁহাকে সামাজিক নাটকের উপযোগী কোনও বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। ঈশ্বরবাবু ঠিক করিয়া দিলেন —বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়। বিষয় যেমন স্থির হইল, অমনি কাগজে এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল যে, যিনি পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের উপর একখানি উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটক রচনা করিতে পারিবেন, এবং যাঁহার রচনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাঁহাকে দুইশত টাকা পুরস্কার দেওয়া



৺কৃষ্ণবিহারী সেন

হইবে। প্রাপ্ত রচনা পরীক্ষার জন্য বিচারক নিযুক্ত হইলেন, প্রেসিডেন্সী কলেজের তাৎকালীন সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। কৃষ্ণবিহারীবাবুর ছোট কথা পছন্দ হইত না বলিয়া, তিনি বিচারকের ইংরাজীতে নাম দিলেন "Adjudicator !"

অল্পদিনের মধ্যেই কয়েকখানি নাটক পাওয়া গেল, কিন্তু একখানিও পুরস্কার-প্রদানের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল না। এরূপ প্রতিযোগিতায় আশানুরূপ সুফল ফলিল না দেখিয়া; Committee of five স্থির করিলেন যে, একজন প্রসিদ্ধ নাটককারের উপর এই রচনার ভার অর্পণ করাই সমধিক সুবিধাজনক। তখন বাঙ্গলা-লেখক অতি অল্পই ছিল। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় এই সময়ে "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নামে একখানি নাটক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন; তাঁহাকেই শেষে এ ভার প্রদত্ত হইল। তিনি একখানি সামাজিক নাটক লিখিতেও স্বীকৃত হইলেন। জ্যোতিবাবু বলিলেনঃ—"পণ্ডিত রামনারায়ণ ইংরাজি জানিতেন না, তিনি খাঁটি দেশীয় আদর্শেই নাটক রচনা করিতেন। তাঁহাকেই প্রকৃতরূপে আমাদের বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রথম (National Dramatist) জাতীয় নাট্যকার বলা যাইতে পারে।"

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অভিভাবকগণ যখন দেখিলেন যে, ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে, তখন যাহাতে আর ছেলে-মানুষী অথবা কোনরূপ "ধাষ্টামো" না হয়, সেজন্য তাঁহারাই এবার এ কার্য্যের সমস্ত ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, এবং পুরস্কারের পরিমাণও পাঁচশত করিয়া দিলেন। জ্যোতিবাবুরা যেমন নিস্কৃতি পাইলেন, তেমনি অধিকতররূপে উৎসাহিতও হইয়া উঠিলেন।

নাটক রচিত হইল। নাটকের নাম "নবনাটক"। যেদিন

এই উপলক্ষ্যে তর্করত্ন মহাশয়কে পুরস্কার প্রদান করা হয়, সে একটি স্মরণীয় দিন। কলিকাতার সমস্ত ভদ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া, সভার মধ্যস্থলে একটা রূপার থালায় নগদ ৫০০৲ টাকা সাজাইয়া রাখা হইল, এবং সভাস্থলে নাটক খানি আদ্যোপান্ত পঠিত হইল। শুনিয়া সকলেই প্রশংসা করিলেন। তখন ঐ পাঁচশত টাকা তর্করত্ন মহাশয়কে প্রদান করা হইল। তিনিও ইহাতে খুব খুসী হইয়াছিলেন।

জ্যোতিবাবু বলিলেন—"পণ্ডিত রামনারায়ণের এই "নবনাটকে" বিদেশী আদর্শের একটু গন্ধ যে একেবারে না ছিল তাহাও নহে। আমাদের সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে কোন বিয়োগান্ত নাটক নাই। তিনি ইংরাজি শিক্ষিত লোকদিগের রুচিকে প্রশ্রয় দিয়াই, খাঁটি বাঙ্গালায় এই সর্ব্বপ্রথম বিয়োগান্ত নাটক রচনা করিলেন।

"এখন হইতে "বড়"র দলই অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। দোতলার হলের ঘরে ষ্টেজ বাঁধা হইল। তারপর পটুয়ারা আসিয়া সীন্ (Scene) আঁকিতে আরম্ভ করিল। 'ড্রপ-সীনে' রাজস্থানের ভীমসিংহের সরোবরতটস্থ "জগমন্দির" প্রাসাদ অঙ্কিত হইল। নাট্যোল্লিখিত পাত্রগুলির পাঠ আমাদের সবাইকে বিলি করিয়া দেওয়া হইল। আমি হইলাম নটী, আমার জ্যেঠতুত ভগিনীপতি ৺নীলকমল মুখোপাধ্যায় (পরে গ্রেহামের বাড়ীর মুচ্ছুদি) সাজিলেন নট, আমার নিজের আর এক ভগিনীপতি ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায় "চিত্ততোষ", আর এক ভগিনীপতি ৺সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় হইলেন গবেশ বাবুর বড় স্ত্রী। সুপ্রসিদ্ধ কমিক অক্ষয় মজুমদার লইলেন গবেশবাবুর পাঠ। বাকী আমাদের অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু ইহাতেও কুলাইল না। বাহির হইতেও অভিনেতার আমদানি



৺রামনারায়ণ তর্করত্ন

করিতে হইল। ক্রমে, কলিকাতার অন্যান্য সরকারী বেসরকারী অনেক আফিসের কর্ম্মচারী কতকগুলি ভদ্রলোকও আসিয়া, আমাদের অভিনয়ে যোগ দিলেন। শেষে অভিনয়ের জন্য অনেক উমেদার আপনা হইতেই আসিয়া উমেদারী জুড়িয়া দিল। অভিভাবকেরা পরীক্ষা করিয়া করিয়া, অভিনেতা নির্ব্বাচিত করিয়া লইলেন।

"অতঃপর ভূমিকা সমস্ত স্থির হইয়া গেলে, দোতলার বড় ঘরে, খুব ঘটা করিয়া রিহার্শাল বসিয়া গেল। প্রথমে শুধু পাঠ চলিতে লাগিল। দুই একজন সমজ্‌দার লোক উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহারা পাঠ ও ভঙ্গী সম্বন্ধে উপদেশ এবং ভুলভ্রান্তি সব সংশোধন করিয়া দিতেন। তারপর ক্রমে অঙ্গভঙ্গীর শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। এইরূপে ছয় মাস কাল যাবৎ দিনে রিহার্সাল, আর রাত্রে বিবিধ যন্ত্র-সহকারে কন্‌সার্টের মহলা চলিল। আমি কন্‌সার্টে হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতাম।

"এইরূপে অভিনয়ের উদ্যোগে আয়োজনে কিছুকাল আমাদের খুব আমোদেই কাটিয়াছিল। তারপর যেদিন প্রকাশ্য অভিনয় হইবে, সে দিন এক অভাবনীয় কাণ্ড উপস্থিত হইল। যাহারা স্ত্রীলোকের ভূমিকা লইয়াছিল, অভিনয়ের ঠিক পূর্ব্বেই তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখীন হইবার ভয়ে, সাজঘরে ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতে লাগিল। ভাগ্যক্রমে আমাদের বাড়ীর ডাক্তার দ্বারিবাবু উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাহাদিগকে তোয়াজ করিয়া, অল্প সময়ের মধ্যেই খাড়া করিয়া তুলিলেন। প্রথমটা লজ্জা ও সঙ্কোচে কতকটা সবারই বাধ'-বাধ' ঠেকিতেছিল, কিন্তু দুই একবার অবতীর্ণ হইয়া সকলেরই সে জড়সর ভাবটা কাটিয়া গিয়া, ক্রমে ক্রমে ভাব ভঙ্গী বেশ সহজ ও সরল হইয়া আসিল। কেবল স্ত্রীবেশে সজ্জিত আমার

কবিবন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী শেষ মুহূর্ত্তে কিছুতেই সাহস করিয়া দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখীন হইতে পারিলেন না। আমাদের অনুরোধ উপরোধ সবই ব্যর্থ হইল। কি করা যায়, অগত্যা তাঁহাকে বাদ দিতে হইল।

"অভিনয় দর্শনের জন্য কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও ভদ্রলোকেরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অভিনয়ও খুব নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদিগের দ্বারা দৃশ্যগুলি (Scene) অঙ্কিত হইয়াছিল। ষ্টেজও (রঙ্গমঞ্চ) যতদূর সাধ্য সুদৃশ্য ও সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব, চেষ্টার কোনও ক্রটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সীন্‌খানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আটা দিয়া জুড়িয়া, অতি সুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত। এই সব জোনাকী পোকা ধরিবার জন্য অনেকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়া, তাহাদের পারিশ্রমিক স্বরূপ এক একটি পোকার দাম দুই আনা হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল।

"অভিনয়কালে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে কখন বা হাসির ফোয়ারা ছুটিত, কখন বা অশ্রুজলের ধারা বর্ষিত হইত দেখিয়া, আমাদের উৎসাহ খুব বাড়িয়া যাইত। যখন গবেশবাবুর ছোটগিন্নি ও বড়গিন্নি, গবেশবাবুর এক-একটা পা দখল করিয়া তৈলমর্দ্দন করিবার জন্য টানাটানি করিত, আর বলিত—"এটা আমার পা, তুই আমার পা-টায় কেন তেল মাখাচ্ছিস" ইত্যাদি, তখন গবেশবাবুর অবস্থা ও মুখভঙ্গী দেখিয়া দর্শকেরা কেবল হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেই বাকী রাখিত। বড়স্ত্রী গবেশবাবুকে বশ করিবার



৺নীলকমল মুখোপাধ্যায়

ও

৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায়

জন্য “ঔষধ করায়”, গবেশবাবুর উদরটা ফুলিয়া ঢাক হইয়া উঠিয়াছিল। গবেশবাবু যখন তাঁহার লম্বোদরটি আরও ফুলাইয়া দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে বসিতেন, তখন এই সামান্য দৃশ্যেই সকলে হাসির লহর তুলিত। আবার ডাক্তার দ্বারিবাবু কিংবা বেলিসাহেব দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত থাকিলে, তিনি রোগের যন্ত্রণায় কাতরাইতে কাতরাইতে ক্ষীণকণ্ঠে যখন বলিতেন, “শীগ্‌গির দ্বারিবাবুকে কি বেলিসাহেবকে একবার ডেকে আন”—তখন উক্ত ডাক্তারেরাও যেমন হাসিতেন, তেমনি আমাদের দর্শকমণ্ডলীর মধ্যেও একটা প্রবল অট্টহাস্যের বন্যা বহিয়া যাইত। অক্ষয়বাবুর অভিনয়ে একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি বই ছাড়া অনেক কথা উপস্থিত মত বানাইয়া বলিতে পারিতেন। আমরা তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—“অত লোকের সামনে বেহায়ামি করিতে আপনার কি একটুও সঙ্কোচ হয় না?” তিনি বলিলেন—“আমার একটা মন্ত্র আছে, আমি অভিনয়কালে দর্শকদিগকে বানর বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকি।”

“আমার ভগিনীপতি ৺যদুনাথও খুব একজন ভাল হাস্যরসিক অভিনেতা (Comic Actor) ছিলেন—তিনিও উপস্থিতমত মনগড়া অনেক কথা বলিয়া, দর্শকদিগকে হাসাইতে পারিতেন। গবেশবাবুর পারিষদ “চিত্ত-তোষে”র পাঠে, তিনি প্রতিপদে গবেশবাবুর বাক্য “জল উঁচু নীচু” ধরণে সমর্থন করিয়া, লোককে মোহিত করিতেন। আর একবার হাস্যের তরঙ্গ উঠিত, যখন চ্যাপ্‌টা-নাক, রং-ফরসা “রসময়ী” গোয়ালিনী দুধের কেঁড়ে কাঁখে প্রবেশ করিয়া, “কৌতুকের” সহিত রসালাপ করিত। শ্রীযুক্ত মতিলাল চক্রবর্ত্তী এই “কৌতুকে”র পাঠ লইয়াছিলেন। তিনিও একজন সুন্দর হাস্যরসিক ছিলেন। সেই সকল অভিনেতাদের মধ্যে

অনেকেই এখন ভবরঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, কেবল একমাত্র আমিই এখনও সশরীরে বর্ত্তমান আছি।

"আমার এক শ্যালক অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ছোটগিন্নির ভূমিকায় যখন আর্শির সম্মুখে বসিয়া প্রসাধন করিতেন, ও যৌবন-গর্ব্বে গর্ব্বিতা রূপসীর হাবভাবের অভিনয় করিতেন, তখন সে অভিনয়েও দর্শকেরা খুব আমোদ পাইত। আমাদের আরও দুইজন (tragic actor) করুণ-রসের অভিনেতা ছিলেন। ৺বিনোদলাল গঙ্গোপাধ্যায় (অমৃত লালের জ্যেষ্ঠ) যখন সুবোধের ভূমিকায়, সৎমার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া গৃহ ছাড়িয়া বিরাগী হইয়া, নৈশ অন্ধকারে বন-বাদাড় দিয়া চলিয়াছেন, এবং যখন ৺সারদাপ্রসাদ বড়স্ত্রীর ভূমিকায় সপত্নীর জ্বালায় দগ্ধ হইয়া মর্ম্মভেদী আক্ষেপোক্তি করিতেন, তখন দর্শকবৃন্দ বাস্তবিকই অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিত না। তারপর গবেশবাবুর মৃত্যু হইলে, "অমলা" "কমলা" "চন্দ্রকলা" প্রভৃতি গবেশবাবুর পুরস্ত্রীগণ এরূপ মড়াকান্না জুড়িয়া দিত যে, সেই রোদনরোল শুনিয়া পাড়ার লোকের পর্য্যন্ত আতঙ্ক উপস্থিত হইত।

"প্রথম দিনের অভিনয়ে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় শেষ হইলে, তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া—"যা—রা পলাট্ (plot) নাই, পলাট্ নাই বলে, এখানে এসে একবার দেখে যাক্" —সমালোচকদিগের উপর এইরূপ মধুবর্ষণ করিতে করিতে, তিনি আপনার আনন্দ-সাফল্যে গর্ব্বিত হইয়া খুব আস্ফালন করিয়াছিলেন।

"এই নাটকখানি দর্শকগণকে এত মোহিত করিয়াছিল যে, তাঁহাদের অনুরোধে একাধিক রজনী "নবনাটক" অভিনীত হইয়াছিল। যে উদ্দেশ্যে এত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম, তাহা কতক পরিমাণে সফল



৺সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, কেননা "নবনাটক" তখন দেশে বেশ একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল।"

একদিনকার অভিনয়ে একটা বেশ কৌতুককর কাণ্ড ঘটিয়াছিল। জ্যোতিবাবু নটীর বেশ পরিয়াই, সাজঘরে (Green Room-এ) কন্‌সার্টের সহিত হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতেছিলেন। হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত Seton Car সেদিন নিমন্ত্রিত হইয়া অভিনয়দর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি কন্‌সার্ট শুনিবার জন্য, এবং কি কি যন্ত্রে কন্‌সার্ট বাজিতেছে দেখিবার জন্য, কন্‌সার্টের ঘরে ঢুকিয়াছিলেন। ঢুকিয়াই "Beg your pardon, জেনানা, জেনানা" বলিয়াই অপ্রভিত হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পরে তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, জেনানা কেহই ছিলেন না, যাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তিনি স্ত্রী-সাজে-সজ্জিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

নটীবেশে জ্যোতিবাবুকে সংস্কৃতে রচিত একটি বসন্তবর্ণনার গান গাহিতে হইত। তাহার প্রথম ছত্র ছিল—

"মলয়ানিল পরিহার পুরঃসর" ইত্যাদি।

"তখন কন্‌সার্ট-পদবাচ্য ভাল কন্‌সার্ট ছিল না বলিলেই হয়। এক যাহা ছিল তাহা মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতেই ছিল। তার পর "নব নাটক" উপলক্ষ্যে আমাদের বাড়ীতেও আর একটি দল হইল।* সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তখনও কন্‌সার্ট প্রচলিত হয় নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ বিষ্ণুবাবুই তখন এই

---

* "নবনাটক" উপলক্ষ্যে জ্যোতিবাবুদের কনসার্টে নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হইত—হার্ম্মোনিয়ম, দুই তিনখানি বেহালা, ক্ল্যারিওনেট, পিক্‌লো, বড় বাস্‌ বেহালা (violincello), করতাল, ঢোল, বাঁয়াতব্‌লা এবং মন্দিরা।

কন্‌সার্টের গৎ তৈরি করিয়া দিতেন। তারপর এখন ত গলিতে গলিতে কন্‌সার্ট।"

তখনকার কন্‌সার্ট হইতে এখনকার কন্‌সার্ট উন্নত বলিয়া তাঁহার বোধ হয় কি না জিজ্ঞাসা করায়, জ্যোতিবাবু বলিলেন—"তখনকার হইতে কন্‌সার্ট এখন বিশেষ যে কিছু উন্নতিলাভ করিয়াছে, ইহা ত আমার মনে হয় না।"



স্বর্গীয় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

নব্যতন্ত্র

গৃহ-সংস্কার

হিন্দুমেলা

জ্যোতিবাবু বলিলেন—"পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের অন্তঃপুরে আগে সেই "ভবিষ্যযুক্ত" বৈষ্ণবীটি আসিয়া মেয়েদিগকে বাঙ্গলা পড়াইত। তাহার পর কিছুদিন একজন খৃষ্টান মিশ্‌নরী মেম আসিয়া ইংরাজী পড়াইয়া যাইত। ইহার পর অযোধ্যানাথ পাকৃড়াশী মহাশয় মেয়েদিগকে সংস্কৃত পড়াইতেন। এই সময়ে আমার সেজদাদাও (হেমেন্দ্রনাথ) মেয়েদিগকে "মেঘনাদবধ" প্রভৃতি কাব্য পড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর মেজদাদা (সত্যেন্দ্রনাথ) বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, মেয়েদের জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন বাড়িতেছিল এবং তাঁহাদের হৃদয়মনের ঔদার্য্যও অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছিল। আমি সন্ধ্যাকালে সকলকে একত্র করিয়া, ইংরাজী হইতে ভাল ভাল গল্প তর্জ্জমা করিয়া শুনাইতাম—তাঁহারা সেগুলি বেশ উপভোগ করিতেন। ইহার অল্পদিন পরেই দেখা গেল যে, আমার একটী কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি আমায় সেইগুলি শুনাইতেন। আমি তাঁহাকে খুব উৎসাহ দিতাম। তখনও তিনি অবিবাহিতা।

"বিবাহের পর তিনি "দীপনির্ব্বাণ" নামে একখানি উপন্যাস লেখেন। "দীপনির্ব্বাণ" প্রকাশিত হইলে, সকল কাগজেই ইহার খুব প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে "পৃথিবী"

নামে ইনি একখানি গভীর গবেষণাপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পুস্তকও প্রকাশিত করেন, সেখানিও সর্ব্বজন-প্রশংসিত হইয়াছিল।*

---

* বঙ্গাব্দ ১২৮৩ (ইংরাজি ১৮৭৭) সালে, স্বর্ণকুমারীর "দীপনির্ব্বাণ" প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার দুই বৎসর পরেই তাঁহার "ছিন্নমুকুল" নামে আর একখানি উপন্যাস এবং "বসন্ত উৎসব" নামে একখানি গীতিনাট্য প্রকাশিত হয়। ১২৮৭ সালে তাঁহার "গাথা" প্রকাশিত হয়। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, স্বর্ণকুমারীই বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম গাথা রচনা করেন। গাথা-রচনায় রবীন্দ্রনাথও তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পদানুসরণ করিয়াছেন। এই সময়ে স্বর্ণকুমারী নিয়মিতরূপে "ভারতী"তে লিখিতেন। ১২৮৮ সালে তাঁহার "মালতী" নামে আর একখানি ছোট উপন্যাস প্রকাশিত হয়। তাঁহার ষষ্ঠ গ্রন্থ "পৃথিবী" ধারাবাহিকভাবে ভারতীতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলীর সংগ্রহ। বাঙ্গলা দেশে এবং বঙ্গসাহিত্যে স্বর্ণকুমারীই সর্ব্বপ্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক। ইঁহার পূর্ব্বে অন্য কোনও বঙ্গমহিলা বঙ্গভাষায় উপন্যাস, গীতিনাট্য, অথবা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বলিয়া, আমাদের জানা নাই। তৎকালে Calcutta Review (Jany. 1881), সাধারণী, Indian Mirror, Brahmo Public Opinion, নববিভাকর, Sunday Mirror (Sept 11, 1889), Hindoo Patriot. বান্ধব (পৌষ ১২৮৫) প্রভৃতি সাময়িক ও সংবাদপত্রাদিতে স্বর্ণকুমারীর গ্রন্থাবলীর সুদীর্ঘ সুখ্যাতিপূর্ণ সমালোচনাও বাহির হইয়াছিল। যাহাই হউক, স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য-খ্যাতিতে তখন যে দেশবাসীর চক্ষে স্ত্রীশিক্ষার একটি অতি পবিত্র মাধুর্য্যপূর্ণ শুভঙ্করী মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

নিম্নে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর পুস্তকাবলী ও তাহাদের প্রথম প্রকাশের তারিখও লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম—দীপনির্ব্বাণ (১২৮৩, ইং ১৮৭৭), নবকাহিনী (১২৮৩), ছিন্নমুকুল (১২৮৫), বসন্ত উৎসব (১২৮৬), গাথা (১২৮৭), মালতী (১২৮৮), পৃথিবী (১২৮৯), মিবাররাজ (১২৯৬), বিদ্রোহ (১২৯৭), স্নেহলতা (১২৯৯), ফুলের মালা (১৩০১), কবিতা ও গান (১৩০২), কাহাকে (১৩০৫), ইমামবাড়ী



৺জানকীনাথ ঘোষাল

"তাহার পর ক্রমশ, তাঁহার উপন্যাসের পর উপন্যাস প্রকাশিত হইতে লাগিল—আমার দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইত।

"আগে আমাদের বাড়ীতে অবরোধপ্রথা খুবই মানিয়া চলা হইত। মেয়েদের এবাড়ী ওবাড়ী যাইতে হইলেও ঘেরাটোপ-ঢাকা পাল্কীতে চড়িয়া যাইতে হইত; এবং পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে ২।১ জন করিয়া দারোয়ানও যাইত। যে সকল পুরস্ত্রীগণ গঙ্গাস্নানে যাইতেন, তাঁহাদিগকে পাল্কী করিয়া লইয়া গিয়া, পাল্কীসুদ্ধ জলে ডুবাইয়া আনা হইত। কিন্তু এই অবরোধপ্রথার বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম মেজদাদা অস্ত্রধারণ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে আর কেহই হস্তোত্তোলন করিয়াছিলেন বলিয়া, আমার মনে হয় না। এই অসমসাহসিক কার্য্যের জন্য তাঁহাকে তৎকালীন জন-সমাজে অনেক অপ্রিয় মন্তব্যও সহ্য করিতে হইয়াছিল। ফলে আমাদের অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যে গাড়ীর চলন হইয়া পড়িল।

"স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে যখন শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষালের বিবাহ হইল, তখন আমাদের অন্তঃপুরে আরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে আমাদের শুইবার ঘরে খাট-বিছানা ছাড়া

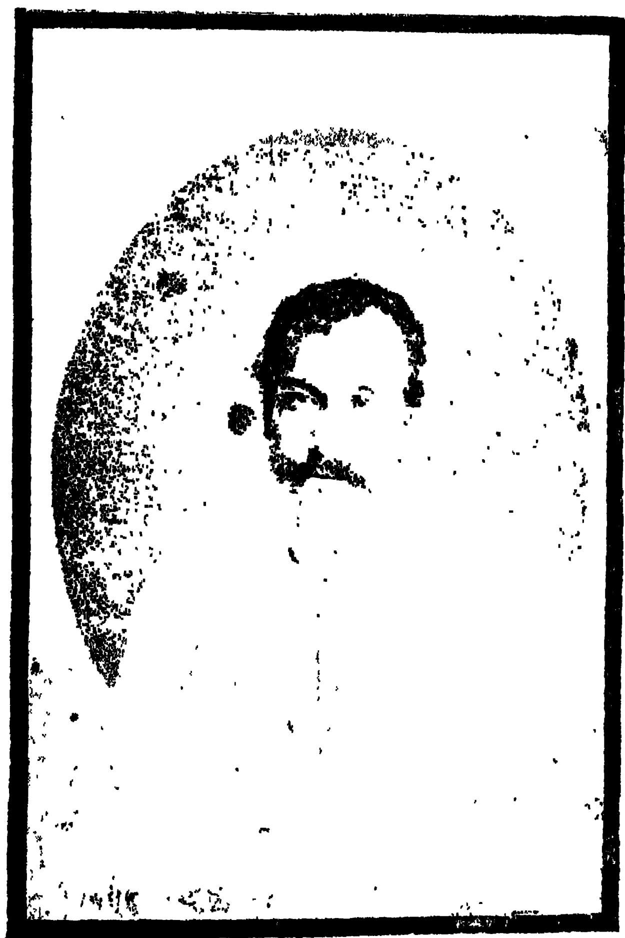
(১৩০৮ ইং ১৯০১), কৌতুকনাট্য (১৩০৮ ইং ১৯০১), দেবকৌতুক (১৩১২), কনে-বদল (১৩১৩), পাকচক্র (১৩১৯), রাজকন্যা (১৩২০)। এতদ্ভিন্ন স্বর্ণকুমারীর রচিত কয়েকখানি শিশুপাঠ্য পুস্তকও আছে; যথা—গল্পস্বল্প, সচিত্র বর্ণবোধ, বাল্যবিনোদ, প্রথমপাঠ্য ব্যাকরণ এবং কীর্ত্তিকলাপ।

লেখিকা মহাশয়ার ভ্রমণ এবং নক্ষত্রজগৎ সম্বন্ধীয় অনেকগুলি প্রবন্ধ যাহা ভারতীতে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল—এখনও সেগুলি অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে। ১৭ই শ্রাবণ ১৩২১।

অন্য কোনও তেমন আসবাবপত্র থাকিত না; কিন্তু জানকী-বাবু আসিয়াই, তাঁহার ঘরটি নানাবিধ চৌকি কৌচ কেদারায় অতি পরিপাটিরূপে যখন সজ্জিত করিলেন, তখন তাঁহার অনুকরণে ক্রমে ক্রমে আমাদের অন্তঃপুরের সমস্ত ঘরগুলিরই শ্রী ফিরিয়া গেল। কক্ষগুলির আমূল সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইল, এবং রীতিমত সুসজ্জিত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। জানকী আমাদের পরিবারে আরও একটি নূতন জিনিষের প্রবর্ত্তন করেন। সেটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

"অক্রূরচন্দ্র দত্তের বাড়ীর রাজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয় কলিকাতায় তখন একজন সুবিখ্যাত অর্থাপ্রতিগ্রাহী (amateur) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎ-সক। তিনিই ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়কে হোমিওপ্যাথিক-তন্ত্রে দীক্ষিত করেন। জানকী তাঁহাকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া আসেন।

"রাজেন্দ্রবাবু এক রকম নূতন রান্না আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার নাম "রাজভোগ"। তাঁহার নবাবিষ্কৃত এই রান্নাটি খাইতে আমরা ঔৎসুক্য প্রকাশ করায়, তিনি একদিন আমাদের বাড়ীতে তাহার উদ্যোগ করিলেন। চাল ডাল চড়াইয়া, আমাদিগকে বলিলেন, "এইবার তোমাদের যাহার যাহা ইচ্ছা, ইহাতে নিক্ষেপ কর।" এই কথায়, আমরা কেউ আমসত্ব, কেউ তেঁতুল, কেউ মাছ, কেউ গুড়, কেউ লঙ্কা, কেউ রসগোল্লা প্রভৃতি যাহার যাহা ইচ্ছা হইল, তাহাই দিলাম। কিয়ৎক্ষণ উক্ত উপকরণগুলি চাল ডালের সহিত সিদ্ধ হইয়া, আহা, সে যে কি উপাদেয় বস্তুই প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা আর কি বলিব! তাঁহার সহিত আমরাও সারিবন্দি হইয়া "রাজভোগ" ভোজনে বসিয়া গেলাম, কিন্তু মুখে দিবামাত্রই, বহুদিন পূর্ব্বে পীত মাতৃদুগ্ধ পর্য্যন্ত জঠরে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।



স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

"এই সময়ে সেজদাদা (৺হেমেন্দ্রনাথ) একবার খুব পীড়িত হইয়াছিলেন। আমাদের গৃহচিকিৎসক বেলিসাহেব তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেছিলেন। আবার তলে তলে রাজেন্দ্রবাবুর হোমিওপ্যাথিও চলিতেছিল। একদিন রাজেন্দ্রবাবু রোগীর ঘর হইতে বাহির হইতেছিলেন, এমন সময় বেলিসাহেব রোগীকে দেখিতে আসেন। দুয়ারেই দুইজনের চারি চক্ষের শুভমিলন। রাজেন্দ্রবাবুকে যেমন দেখা, বেলিসাহেব একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে টুপি ফেলিয়াই, তিনি একছুটে গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া পড়িলেন। রাগে গম্ গম্ করিতে করিতে, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন "মার্চ্চেণ্ট আবার ডাক্তার?" এই বিপদে গণেন্ দাদা সাহেবের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, তাঁহাকে অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া আবার ফিরাইয়া আনিলেন।

"গণেন্দাদাও একজন সুলেখক ছিলেন। নাট্যাকারে তিনি "বিক্রমোর্ব্বশী"র অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি অতি চমৎকার ব্রহ্ম-সঙ্গীতও রচনা করিতে পারিতেন। "গাও হে তাঁহারি নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম" প্রভৃতি সুন্দর গানগুলি তাঁহারই রচিত। তিনি ইতিহাস খুব ভালবাসিতেন। অনেকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধও তিনি লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অপ্রকাশিত রচনা এখনও থাকিতে পারে। তিনি খুব অল্প বয়সেই মারা যান।"

এই সময়েই শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে ও শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আনুকুল্য ও উৎসাহে "হিন্দুমেলা" প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়েরা হইলেন, মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার

ঘোষ এবং মনোমোহন বসুও* এই মেলায় খুব উৎসাহী ছিলেন। এই হিন্দুমেলাই বঙ্গদেশে, যদি সমগ্র ভারতবর্ষে না-ও হয়, সর্ব্বপ্রথম জাতীয় শিল্প-প্রদর্শনীর (National Industrial Exhibition এর) পত্তন করিল। এ মেলায় তখন কৃষি, চিত্র, শিল্প, ভাস্কর্য্য, স্ত্রীলোকদিগের সূচি ও কারুকার্য্য, দেশীয় ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যায়াম প্রভৃতি জাতীয় সমস্ত বিষয়ই প্রদর্শিত হইত। এই মেলা উপলক্ষ্যে কবিতা প্রবন্ধাদিও পঠিত হইত।

নবগোপালবাবু দেখা হইলেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে উত্তেজনাপূর্ণ জাতীয় ভাবের কবিতা লিখিতে অনুরোধ করিতেন। জ্যোতিবাবু এ সময়ে কবিতা লিখিতেন না, বা ইহার পূর্ব্বেও কখন লেখেন নাই। কিন্তু ক্রমাগত অনুরুদ্ধ হওয়ায়, তিনি একটি কবিতা † লিখিয়াছিলেন। কবিতাটি রচিত হইবামাত্র, নবগোপালবাবু গণেন্দ্রবাবুকে দেখাইতে লইয়া গেলেন। জ্যোতিবাবু সেখানে গিয়া কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া শুনাইলে, গণেন্দ্রবাবু "বেশ হয়েছে, এটা এবার মেলায় পড়্‌তে হবে" বলিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সেবারকার মেলায় শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য (পরে শাস্ত্রী—সম্প্রতি পরলোকগত), শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও জ্যোতিবাবু—এই তিনজনের তিনটি কবিতা পঠিত হয়। জ্যোতিবাবুর কণ্ঠস্বর খুব ক্ষীণ, অত ভিড়ের মধ্যে ঠিক শোনা যাইবে না বলিয়া, ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেটি বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে পাঠ করিয়াছিলেন। সেবারকার মেলায় সভাপতি ছিলেন ৺গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* সতীনাটক হরিশচন্দ্র প্রভৃতি নাটকপ্রণেতা এবং "মনোমোহন লাইব্রেরী" নামক পুস্তকের দোকানের সত্ত্বাধিকারী।

† ১৩১৩ সালের পৌষ সংখ্যা "ভারতী"তে কবিতাটি বহুদিন পরে প্রকাশিত হইয়াছিল।



৺গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোন বিষয়ে কোনও প্রকার বাড়াবাড়ি অথবা রাজদ্রোহ বা শান্তিভঙ্গ না হয়, তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য বন্ধুভাবে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

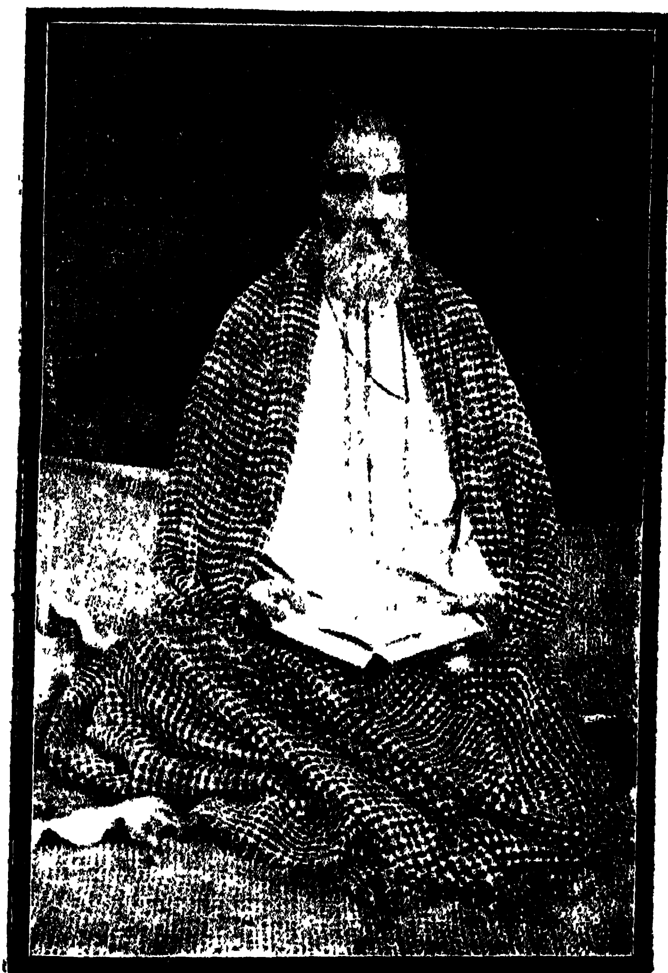
জ্যোতিবাবু বলিলেন, "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আমল হইতেই প্রকৃতপক্ষে স্বদেশীভাবের প্রচার আরম্ভ হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় উক্ত পত্রিকাতে ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী লিখিয়া,লোকের মনে সর্ব্বপ্রথম দেশানুরাগ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন ; তাহার পর ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় হিন্দুমেলার কল্পনা করিয়া, এবং ৺নবগোপাল মিত্র মহাশয় অনুষ্ঠানে তাহা পরিণত করিয়া, এই স্বদেশীভাবের প্রবাহে সে সময়ে প্রচণ্ড একটা বলসঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন। বলিতে গেলে, পূর্ব্বে আদিব্রাহ্মসমাজই তখন স্বদেশীভাবের প্রধান কেন্দ্র ছিল। যখন কেশববাবু তাঁহার দলবলসহ আদিব্রাহ্মসমাজকে ত্যাগ করিলেন, তখন নবগোপালবাবু প্রভৃতি কয়েকজন প্রখ্যাত এবং অকৃত্রিম জনহিতৈষী সহৃদয় লোকনেতা আদিব্রাহ্মসমাজের পতাকাতলে দাঁড়াইয়া, সংবাদপত্রাদিতে লিখিয়া ও মৌখিক বক্তৃতা দিয়া, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আদিসমাজের পক্ষসমর্থন করিতে লাগিলেন। স্বদেশীভাব প্রচার করিবার জন্য পিতৃদেবের অর্থসাহায্যে National Paper নামক একখানি ইংরাজি সাপ্তাহিকও বাহির হইল।

"কতকগুলা "মড়া-খেগো" ঘোড়া লইয়া, নবগোপালবাবুই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী সার্কাসের সূত্রপাত করেন। আজ যে বোসের সার্কাসের (Bose's circusএর) কৃতিত্ব এবং নানা প্রশংসা-বাণী শুনা যায়, উহা তাহারই পরিণতি এবং নবগোপালবাবুর অনুষ্ঠিত সেই প্রথম বাঙ্গালী সার্কাসেরই চরম ক্রমোন্নতিই বলিতে হইবে। তিনি এত করিলেন, অথচ এখন তাঁহার নামও কেহ করে না। ইহা বড়ই

আক্ষেপের বিষয়। এ দেশে তাঁহার ন্যায় স্বদেশানুরাগী নীরব কর্ম্মবীরের একটা স্থায়ী স্মৃতি-চিহ্ন থাকা নিতান্ত আবশ্যক।”

এই সময়ে কাথ্রাঁ (Cathrin) নামে একজন ফরাসী ৺হেমেন্দ্রনাথের নিকট চাকরীর জন্য আসিয়াছিল। হেমেন্দ্রবাবু তাহাকে ত্রিশটাকা বেতনে পাচক নিযুক্ত করিলেন। সর্ত্ত হইল, সে পাকও করিবে, ফরাসী ভাষাও পড়াইবে। একবার হেমেন্দ্রনাথ সপরিবারে বোলপুর গিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন।

“প্রতিভা (এখন মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী) তখন দুই বৎসরের শিশু। কাথ্রাঁকেও সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল। হিন্দুমতে আমাদের ব্রাহ্মণ রাঁধিত—কাথ্রাঁও তাহাই খাইত, তাহাতে সে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট ছিল না—তবে তাহার ভাতের পরিমাণটা আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। সে আমাদের সঙ্গে ফরাসীতেই কথা বলিত, ফরাসীতেই গল্প করিত। তাহার কারণ, সে ফরাসী ভিন্ন আর কোনও ভাষাই জানিত না। আমাদের বিলাতী খানা খাইবার ইচ্ছা হইলে, সেই রাঁধিত। সে অল্প খরচে নানাবিধ সুখাদ্য ডিস্ প্রস্তুত করিতে পারিত। সে আবার অবসর মত প্রতিভাকে দোলও দিত। তাহার জন্য গাছে সে একটা দোলনা টাঙ্গাইয়াছিল। দোল দিতে দিতে সে “হাপ্‌লা—হাপ্‌লা—” রবে সোল্লাসে চীৎকার করিত। সে আবার সেজদাদাকে জিম্‌ন্যাষ্টিক্‌ও শিখাইত। কাথ্রাঁ বোলপুরে থাকিতে, সেখানকার খোঁয়াড় হইতে কতকগুলি স্ফটিক পাথর জমা করিয়াছিল। তাহার পর এক একটা কাঠি বেশ পরিষ্কার করিয়া চাঁচিয়া ছুলিয়া, তাহাতে ঐ সব পাথরগুলি ফলার মত করিয়া বসাইয়া, একদিন সে কি একটা যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। কলিকাতার King Hamilton কোম্পানি সেই পাথর-বসানো কাঠির প্রত্যেকটি ষোল টাকা হিসাবে



৺শিবনাথ শাস্ত্রী

তাহার নিকট হইতে কিনিয়া লইল। এই সব পাথর আমরা কতবার দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাদ্বারা যে কোনও প্রকার কায হইতে পারে, এ ধারণা আমাদের মাথায় কখনও আসে নাই! কিন্তু সে সামান্য একজন অল্পশিক্ষিত ফরাসী,—পাথরগুলিকে কেমন কাযে লাগাইয়া লইল। শুধু কাযে লাগাইল না, তাহার দ্বারা সে গরীব দুপয়সা রোজগারও করিয়া ফেলিল। ইয়ুরোপীয় ও ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে এমনই প্রভেদ!

"তখন জোড়াসাঁকো বাড়ীতে প্রায়ই বন্ধুবান্ধবগণকে ডিনার দেওয়া হইত। কাথ্রাঁই ডিনারের সব প্রস্তুত করিত। একদিনকার ডিনারে, তৎকালীন্ হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ মিত্র মহাশয় আসিয়াছিলেন। আর একবার বঙ্কিমবাবুকেও খাওয়ান হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর কথা পরে বলিব।

"কাথ্রাঁ বাস্তবিক রন্ধনে সিদ্ধহস্ত ছিল। ফরাসীরা অবশ্য রান্নার জন্য বিশেষ বিখ্যাত। ইয়ুরোপের সমস্ত বড় বড় লোকের ঘরে ফরাসী পাচকই থাকে। ফরাসীদের রান্না অনেকটা আমাদেরই মত। ইংরাজদের যেমন এক একটা গোটা জানোয়ার টেবিলে ধরিয়া দেওয়া হয়, ফরাসীদের রীতি কিন্তু সেরূপ নয়। তাহারা মাংস বেশ ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া, তাহাতে নানাবিধ আনাজ ও মশলা দিয়া, বেশ সুস্বাদু ও মুখরোচক করিয়া পাক করে। সে শাক্‌সব্‌জীর নিরামিষ ডিশও অতি সুন্দর রাঁধিতে পারিত। আমাদের যেমন শাকের ঘণ্ট, শুক্তো প্রভৃতি আছে, সেও সস্ (Sauce) ও মশলা দিয়া, এক একদিন সেই ধরণের এক একটা জিনিষ প্রস্তুত করিত। তাহাকে কখনও কি রাঁধিতে হইবে বলা হইত না, কিন্তু সে নিত্য নূতন নূতন রসনা-পরিতোষকারী রন্ধনে যে অদ্ভূত বুদ্ধি ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিত,—তাহাতে আমরা চমৎকৃত না হইয়া পারিতাম না।

"আমাদের সে "চণ্ডীপাঠ হইতে জুতাসেলাই" পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তই করিত—সে হিসাবে তাহার বেতন কিন্তু খুবই অল্প বলিতে হইবে। অনেক দিন পর্য্যন্ত সে আমাদের নিকট ছিল, তারপর এক-বার ছুটি লইয়া বাড়ী যায়। সেখান হইতে সে নিয়মিত পত্রাদিও লিখিত; কিন্তু ফরাসী-জার্ম্মান্ (Franco-German) যুদ্ধ বাধার পর হইতে, আর তাহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বোধ হয়, বেচারা সেই যুদ্ধেই নিহত হইয়াছে।"

সাহিত্য-চর্চ্চা ও সমাজ-সংস্কার

"কিঞ্চিৎ জলযোগ" নামক একখানি প্রহসন রচনা করিয়া এতদিনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সত্য সত্যই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। ইহাই জ্যোতিবাবুর সর্ব্বপ্রথম রচিত গ্রন্থ।

তিনি বলিলেন যে "এ সময়ে আমি কিন্তু পুরাতনপন্থী ছিলাম, তাই মেয়েদের স্বাধীনতা ব্যাপার লইয়া এই গ্রন্থে একটু হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছিলাম। প্রহসনখানি প্রকাশিত হওয়ার পর,প্রায় প্রত্যহই দেখিতাম Indian Mirrorএ আমার উপর কিছু-না-কিছু আক্রমণ থাকিতই। আক্রমণকারীদের মতে বইখানি অশ্লীল বিবেচিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে এ পুস্তকে আমার নাম ছিল না, তবুও কি-করিয়া যেন আমার নাম প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই সমস্ত আক্রমণ আমার নামেই হইত। নব্যপন্থীদলে এই বই লইয়া খুব একটা হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছিল। সমালোচনার জন্য "বঙ্গদর্শনে" এক কাপি পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র খুব ভালই বলিয়াছিলেন। সেই একই সংখ্যা বঙ্গদর্শনে "কিঞ্চিৎ জলযোগ" প্রহসনের একটি এবং স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" গ্রন্থের একটি প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হয়। Christian Herald বলিয়াছিলেন—"এই প্রহসনে দুষ্য কিছুই নাই।" এই সময়ে শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয় বিলাত হইতে দেশে ফিরেন। আমি যখন Calcutta Collegeএ পড়িতাম, তখন হইতেই তিনি আমায় একজন খুব নিরীহ ভালমানুষ বলিয়া জানিতেন। কিন্তু আমার রচিত প্রহসনে খুব একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে শুনিয়া, তিনি "কিঞ্চিৎ জলযোগ" খানি পড়িতে চাহিলেন।

বইখানি পড়িয়া, তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"এতে দোষের কথা ত আমি কই কিছুই দেখিতেছিনা।" পালিত মহাশয়ের অভিমত শুনিয়া, আমি অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলাম। আবার ইহার মধ্যেই National Theatreএ এই বইখানির অভিনয়ও হইয়া গিয়াছিল।

"ইহার কিছুদিন পরে মেজদাদা (সত্যেন্দ্রনাথ) বিলাত হইতে ফিরিয়া, আমাদের পরিবারে যখন আমূল পরিবর্ত্তনের বন্যা বহাইয়া দিলেন, তখন আমারও মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তখন হইতে আর আমি অবরোধপ্রথার বিরোধী নহি,বরং ক্রমে ক্রমে একজন সেরা নব্যপন্থী হইয়া উঠিলাম। ইহারই কিছুদিন পূর্ব্বে স্ত্রীস্বাধীনতার উপর কটাক্ষ-পাত করিয়া আমি "কিঞ্চিৎ জলযোগ" লিখিয়াছিলাম বলিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিলাম। সেইজন্য "কিঞ্চিৎ জলযোগের" দ্বিতীয় সংস্করণ আর আমি ছাপাই নাই।

"স্ত্রীস্বাধীনতার শেষে আমি এত বড় পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম যে, গঙ্গার ধারের কোন বাগানবাড়ীতে সস্ত্রীক অবস্থান কালে আমার স্ত্রীকে আমি নিজেই অশ্বারোহণ পর্য্যন্ত শিখাইতাম। তাহার পর জোড়াসাঁকো বাড়ীতে আসিয়া, দুইটি আরব ঘোড়ায় দুইজনে পাশাপাশি চড়িয়া, বাড়ী হইতে গড়ের মাঠ পর্য্যন্ত প্রত্যহ বেড়াইতে যাইতাম। ময়দানে পৌছিয়া দুইজনে সবেগে ঘোড়া ছুটাইতাম। প্রতিবাসীরা স্তম্ভিত হইয়া গালে হাত দিত। রাস্তার লোকেরা কৌতূহলে ও বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিয়া চাহিয়া, হতভম্ব হইয়া থাকিত। দারোয়ানেরা আমাদের পানে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিত। সে সব দিকে আমার ভ্রূক্ষেপও ছিল না। আমি তখন উদ্দাম নব্যভাবের নেশায় উন্মত্ত! এইরূপে অন্তঃপুরের পর্দ্দা ত উঠাইলামই, সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের পর্দ্দাটিও একবারে উঠিয়া গেল!

"ইহার পরেই আমার উপর আমাদের জমিদারী পরিদর্শন ও সংসারের ভার পড়িল। পিতৃদেব স্বহস্তে আমাকে জমিদারী-সংক্রান্ত অনেক কাযকর্ম্ম শিখাইয়াছিলেন। জমিদারী পরিদর্শন উপলক্ষ্যে একবার গুণু-দাদার সঙ্গে আমাকে কটক যাইতে হইয়াছিল। হিন্দুমেলার পর হইতে, কেবলই আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব-গাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্ত্তন করিলে, হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, কটকে থাকিতে থাকিতেই, আমি "পুরু-বিক্রম" নাটকখানি রচনা করিয়া ফেলিলাম। লিখিয়াই গুণুদাদাকে বইখানি আদ্যোপান্ত শুনাইলাম। তাঁহার এ নাটকখানি খুব ভাল লাগিল। তিনি ছাপাইতে বলিলেন। "পুরু-বিক্রম" প্রকাশিত হইল বটে, কিন্তু প্রথম সংস্করণে এবারেও আমি নাম গোপন করিলাম। "পুরু-বিক্রমে"র সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র উপহাস-চ্ছলে বলিয়াছিলেন যে—"পুরু-বিক্রম বীররসের খতীয়ান্।" সেই সঙ্গে ইহাও বলিয়াছিলেন যে—"এই রকম লোক যদি নাটক লেখেন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।" তাঁহার এরূপ মন্তব্য-প্রকাশের একটা কারণ ছিল। তখন যে সব নাটক বাহির হইত—তাহার অধিকাংশই হইত অশ্লীল, কিন্তু "পুরু-বিক্রমে" সেরূপ কিছুই ছিল না।

"পুরু-বিক্রম শেষে গুজ্‌রাটী ভাষাতেও অনূদিত হয়। য়ুরোপের বিখ্যাত সমালোচক ও সংস্কৃতবিদ্যায় পারদর্শী Sylvin Levi সাহেব গুজ্‌রাটী-সাহিত্যের সমালোচনাপ্রসঙ্গে পুরুবিক্রমের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখানি যে আমারই বাঙ্গলা পুরু-বিক্রমের অনুবাদ, তাহা তিনি জানিতেন না।

"পুরু-বিক্রম প্রকাশিত হওয়ার পর, একদিন Great National Theatre-এর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু* প্রভৃতি কয়েকজন অভিনেতা এই নাটকখানির অভিনয় করিবার জন্য, আমার অনুমতি লইতে আসিয়াছিলেন। তখন তরুণ অমৃতলাল সামান্য একজন অভিনেতা মাত্র, কিন্তু তখনই তাঁহার উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে আমি এক অপূর্ব্ব প্রতিভার আলোক দেখিতে পাইয়াছিলাম।

("সত্যেন্দ্রনাথের "গাও ভারতের জয়" গানটি পুরু-বিক্রমে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছিল। হিন্দুমেলার সময়ে বিষ্ণুবাবু এই গানটিতে একটা চলিত খাম্বাজ সুর বসাইয়া দিয়াছিলেন—সে সুরে যেন তেমন জোর ছিল না। পরে গ্রেট্ ন্যাশন্যাল থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ গানটির বেশ একটা জোরাল' সুর দিয়াছিলেন, সেই সুরেই ইহা এখনও গীত হয়।)

"তারপর বেঙ্গল থিয়েটারেও নাটকখানি অভিনীত হয়। ছাতুবাবু-দের বাড়ীর শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় পুরু সাজিয়া ছিলেন। শরৎ বাবুর একটি অতি সুন্দর শাদা আরব ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটি যেমন তেজীয়ান্

* নাট্যাচার্য্য রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের মুখে শুনিলাম, অমৃতবাবু যখন হিন্দুস্কুলে পড়েন, তখন জ্যোতিবাবু প্রেসিডেন্সিকলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেন। সেটা ইংরাজী ১৮৬৫ সাল। এক একদিন জ্যোতি-বাবুর গাড়ী আসিতে দেরী হইলে, ছুটির পর তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের সিঁড়ির উপর অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন, তখন অমৃতবাবু তাঁহার গাড়ীতে বসিয়া একদৃষ্টে জ্যোতিবাবুর মুখের পানে চাহিয়া থাকিতেন; তিনি বলেন যে idea of Greek beautyর যেটুকু impression তখন তাঁহার মনে ছিল, সেটুকু যেন তিনি জ্যোতিবাবুর সর্ব্বাবয়বে এবং মুখকান্তিতে প্রস্ফুটিত দেখিতেন। এই সৌন্দর্য্য manly সৌন্দর্য্য, তাহাতে effiminacyর লেশমাত্র ছিল না। তিনি আরও বলিলেন যে, একথা পরে জ্যোতিবাবুকে অমৃতবাবু অনেকবার বলিয়াছেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯২০ বঙ্গাব্দ, ২৩শে মাঘ ১৩২৬।



শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু

তেমনি সায়েস্তাও ছিল। এই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, তিনি উন্মুক্ত অসিহস্তে স্বল্পপরিসর নাট্যমঞ্চের উপর আস্ফালনপূর্ব্বক ঘুরিয়া-ফিরিয়া, সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিতেন। ঘোড়াটি কিন্তু এমনই ঠাণ্ডা যে, নীচে ফুট্-লাইট্ (foot-light), চারিদিকে গ্যাসের উজ্জ্বল আলোক, দর্শকগণের ঘনঘন করতালিধ্বনি, যুদ্ধের বাজনা প্রভৃতি এত গোলমালেও কিছুমাত্রও ভীত বা চকিত হইত না। এইরূপে এই দৃশ্যে বীররসের অতি চমৎকার অবতারণা করা হইত।

"এই সময়ের অল্পদিন পূর্ব্ব হইতেই, বড়-লোকদের ভিতরে ঘোড়ায় চড়ার একটা খুব সখ জাগিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত শরৎবাবু, ঠাকুরদাস মাড়, অম্বু গুহ প্রভৃতি অনেকে মিলিয়া কলিকাতার উত্তর-অঞ্চলে একটা ঘোড়দৌড়ের মাঠ ঠিক করিয়াছিলেন। ঘোড়দৌড়ও দুই একবার হইয়াছিল। তারপর রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের পুত্র ঘোড়া হইতে পড়িয়া যেমন মারা গেলেন, অমনি সকলের ঘোড়ায় চড়ার বাতিকও একদম্ ঠাণ্ডা হইয়া গেল।"

এই প্রসঙ্গে জ্যোতিবাবু আর একটি কথা বলিলেন ঃ—

"Lord Mayo-র মৃত্যুর পর তাঁহার ভাল ভাল সব ঘোড়াগুলি নীলামে বিক্রীত হইতেছিল। সেই নীলামে আমিও Iron grey রঙের একটা খুব বড় জাঁকালো ঘোড়া কিনিয়া ফেলিলাম। ঘোড়াটি দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে ইহার কোনরূপ দোষ থাকিতেই পারে না, কারণ যখন লাটসাহেবের ঘোড়া। পরে দেখা গেল যে, সামান্য কিছু-একটা দেখিলেই সে ভড়্কাইত। একদিন বৈকালে সেই ঘোড়ায় চড়িয়া গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাই। তখন কেল্লায় ব্যাণ্ড বাজিতেছিল। দেখিলাম, অনেক সাহেবও ব্যাণ্ড-ষ্ট্যাণ্ডের নিকট পর্য্যন্ত ঘোড়া লইয়া গিয়া ব্যাণ্ড শুনিতেছে, আমিও তবে না যাইব কেন? যেমন ব্যাণ্ডের

শব্দ তাহার কাণে গেল, অমনি সে প্রবলবেগে লম্ফঝম্ফ আরম্ভ করিয়া দিল। ফলে, রাশ্ রেকাব ছিঁড়িয়া, আমি ভূশায়ী হইয়া পড়িলাম। শওয়ার ফেলিয়া লঘুপৃষ্ঠে ক্ষিপ্রতম পদে ঘোড়াও ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটিল। অকস্মাৎ আমার এই দুরবস্থা দেখিয়া, কয়েকজন সহৃদয় ইংরাজ তৎক্ষণাৎ আমার সাহায্যে ছুটিয়া আসিলেন। তখন আমরা খানিক দূর ছুটিয়া গিয়া দেখি যে, ঘোড়াটি একটা ঘাসের জমিতে নিতান্ত নিরীহভাবে, নিশ্চিন্ত মনে ঘাস খাইতেছে। আমি সঙ্গে একজন সহিস্‌ও লইয়া গিয়াছিলাম। দেখিলাম, কিয়দ্দূরে একজন সহিস্ নিশ্চেষ্ট-ভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাহাকে আমারই সহিস্ মনে করিয়া—প্রথমটা খুব একচোট ভর্ৎসনা করিয়া, ঘোড়া ধরিয়া আনিতে বলিলাম। সে বেচারা আমার ধমকধামক খাইয়া, আমার আদেশ প্রতিপালন করিয়া যখন সে নিকটে আসিল, তখন দেখি যে সে আমার সহিস্ই নয়! তখন হইতেই আমি দূরদৃষ্টিহীন (Short-sighted), আর এদিকে সন্ধ্যাও হইয়া আসিয়াছিল। আবার সেই ব্যাণ্ডের ধার দিয়া আমাকে ফিরিতে হইবে! সৌভাগ্যক্রমে, কিছুক্ষণের জন্য ব্যাণ্ড তখন থামিয়াছিল। কোনও প্রকারে সেই ছিন্নাবশিষ্ট রা'শটুকু ধরিয়া, ধীরে ধীরে গাড়ী-ঘোড়ার ভীড়ের মধ্য দিয়া, লালবাজারের মোড় পর্য্যন্ত আসিলাম—কিন্তু চিৎপুরের ভীড় ঠেলিয়া যাইতে আর সাহস হইল না! কাযেই একটা মুটের হাতে ঘোড়াটি দিয়া, সেই খান হইতে পাল্কী চড়িয়া বাড়ী ফিরিলাম। আমার ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া, বাড়ীসুদ্ধ সকলেই খুব চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

"দার্জ্জিলিঙ্গে অবস্থানকালে ঘোড়ায় চড়িয়া আর একবার আমি খুব বিপদে পড়িয়াছিলাম। ঘোড়া ভয় পাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে, একেবারে খাদের নীচে পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল।

তখন আমি ইচ্ছা করিয়া—পড়িয়া গিয়া, রক্ষা পাইলাম। গায়ে যদিও একটু আধটু রক্তপাত হইয়াছিল, কিন্তু একটা খুব বড় পাগ্‌ড়ি ছিল বলিয়া, মাথায় কোনও আঘাত লাগে নাই।"

তাহার পর কটক হইতে কলিকাতা আসিয়া—জ্যোতিবাবু "সরোজিনী" রচনা করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলিলেন—

"রবীন্দ্রনাথ তখন বাড়ীতে রামসর্ব্বস্ব পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত পড়িতেন। আমি ও রামসর্ব্বস্ব দুইজনে রবির পড়ার ঘরে বসিয়াই, "সরোজিনীর" প্রুফ্‌ সংশোধন করিতাম। রামসর্ব্বস্ব খুব জোরে জোরে পড়িতেন। পাশের ঘর হইতে রবি শুনিতেন, ও মাঝে মাঝে পণ্ডিত মহাশয়কে উদ্দেশ্য করিয়া, কোন্ স্থানে কি করিলে ভাল হয়, সেই মতামত প্রকাশ করিতেন। রাজপুত মহিলাদের চিতা-প্রবেশের যে একটা দৃশ্য আছে; তাহাতে পূর্ব্বে আমি গদ্যে একটা বক্তৃতা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। যখন এই স্থানটা পড়িয়া প্রুফ্‌ দেখা হইতেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। গদ্য-রচনাটি এখানে একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া, কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন—এখানে পদ্যরচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাঁধিতে পারে না। প্রস্তাবটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না—কারণ, প্রথম হইতেই আমারও মনটা কেমন খুঁৎ-খুঁৎ করিতেছিল। কিন্তু এখন আর সময় কৈ? আমি সময়া-ভাবের আপত্তি উত্থাপন করিলে, রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তৃতাটির পরিবর্ত্তে একটা গান রচনা করিয়া দিবার ভার লইলেন, এবং তখনই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই "জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া, আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।"

"সরোজিনী" প্রকাশিত হইবামাত্রই কলিকাতার সাধারণ থিয়েটারে বইখানি অভিনীত হইয়া গেল। পুরু-বিক্রম ও সরোজিনী দুইখানিই জনসমাজে খুব প্রশংসালাভ করিল। জ্যোতিবাবুর নাট্যকার বলিয়া একটা খ্যাতিও প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। বিশেষতঃ সরোজিনী অভিনয়ের পর, বাঙ্গলাদেশে জ্যোতিবাবুর যশের বিজয়দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। সকলেই একটা অভূতপূর্ব্ব অমৃতআস্বাদনের তৃপ্তিসুখে বিভোর হইয়া গেল। এক কথায়, সরোজিনী তখন বাঙ্গলানাটকে এক নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছিল।

'কলিকাতা-আর্ট-স্কুলে'র তদানীন্তন শিক্ষক শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বাগচী মহাশয় সরোজিনীর শেষদৃশ্যের একখানি চিত্র পর্য্যন্ত অঙ্কিত করিয়াছিলেন। সে চিত্রখানি পৌরাণিক দেবদেবীর চিত্রের সঙ্গে বাজারে বহুদিন যাবৎ বিক্রীত হইয়াছিল। যাত্রার দলেও সরোজিনী অভিনীত হইতে লাগিল। সরোজিনী-যাত্রা একবার জোড়াসাঁকো বাড়ীতেও হইয়াছিল। সরোজিনীর গান তখন সভায়, মজলিশে, সর্ব্বত্র গীত হইত।

হাওড়ায় একদিন একটা থিয়েটারে সরোজিনীর অভিনয় হয়, জ্যোতিবাবুও তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। যে দৃশ্যে বিজয়সিংহ কর্ত্তৃক সরোজিনীর উদ্ধার সাধিত হয়, সেই দৃশ্যে কিয়ৎক্ষণের জন্য সমগ্র রঙ্গালয় মুখরিত করিয়া, দর্শকগণ উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে ঘনঘন চিৎকার করিয়াছিল, "Thanks, thanks to the young author."

তখনও গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চে নাট্যসাহিত্যে জ্যোতিবাবুরই তখন প্রবল প্রতাপ। জ্যোতিবাবু বলিলেন—"ইহার কিছুদিন পরেই গিরিশবাবু যখন নাটক লিখিতে লাগিলেন, তখন আমরা ক্রমশ হটিয়া পড়িতে লাগিলাম।



স্বর্গীয় কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ

দেখিতে দেখিতে গিরিশবাবুর অসামান্য প্রতিভা নাট্যসাহিত্যে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিল। আমিও নাটক-রচনা যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে ছাড়িয়া দিয়া, সাহিত্যসেবার অন্য পন্থা অবলম্বন করিলাম।

"সরোজিনী-প্রকাশের পর হইতেই, আমরা রবিকে প্রমোশন্ দিয়া আমাদের সম-শ্রেণীতে উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চ্চাতে আমরা হইলাম তিনজন—অক্ষয় (চৌধুরী), রবি ও আমি। পরে জানকী বিলাত যাইবার সময়, আমার কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী আমাদের বাড়ীতে বাস করিতে আসায়, সাহিত্য-চর্চ্চায়, আমরা তাঁহাকেও আমাদের আর একজন যোগ্য সঙ্গীরূপে পাইলাম।"

একদিন জ্যোতিবাবু তাঁহার তেতলার ঘরে বসিয়া, রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, সাহিত্যবিষয়ক একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে হইবে। যেমন কথা, অমনি কায। তৎক্ষণাৎ জ্যোতিবাবু দ্বিজেন্দ্রবাবুকে এই সঙ্কল্প জানাইলেন। দ্বিজেন্দ্রবাবুও এ প্রস্তাবে অনুকূল মত দিলেন। এখন এ পত্রের কি নাম হইবে, এই সমস্যাসমাধানেই সর্ব্বাগ্রে সকলে যত্নবান্ হইয়া পড়িলেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু নাম করিলেন "সুপ্রভাত"—কিন্তু এ নামটি জ্যোতিবাবুদের মনোনীত হইল না, কারণ ইহাতে যেন একটু স্পর্দ্ধার ভাব আসে; অর্থাৎ এতদিনে ইঁহাদের দ্বারাই যেন বঙ্গসাহিত্যের সুপ্রভাত হইল। সুপ্রভাত নাম যখন গ্রাহ্য হইল না, তখন দ্বিজেন্দ্রবাবুই আবার তাহার নাম রাখিলেন "ভারতী"।

সেই ভারতী আজও পর্য্যন্ত তাঁহার ভগিনীদেবীর সঙ্গে দ্বিজেন্দ্র-নাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্রের বাল্যস্মৃতিরক্ষা করিয়া আসিতেছে।

জ্যোতিবাবু বলিলেন,—"ভারতী-প্রকাশ হইতেই আমাদের আর একজন বন্ধুলাভ হইল। ইনি কবিবর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। আগে তিনি বড়দাদার কাছে কখন কখনও আসিতেন, কিন্তু আমার সঙ্গে তেমন আলাপ ছিল না। এখন "ভারতী"র জন্য লেখা আদায় করিবার জন্য আমরা প্রায়ই তাঁহার বাড়ী যাইতাম, এবং এই সূত্রে তিনিও আমাদের বাড়ী আরও ঘনঘন আসিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত—একজন খাঁটি কবি। সর্ব্বদাই তিনি ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। একটা ডাবা-হুঁকা টানিতে টানিতে, তিনি আমাদের সঙ্গে গল্প করিতেন। যখন কোনও সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা হইত, অথবা কোনও গভীর বিষয় চিন্তা করিতেন, তখন তামাক টানিতে টানিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি বুঁজিয়া আসিত, তিনি ভাবে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। আমাদের বাড়ী যখনই আসিতেন, তখনই তিনি আমায় বেহালা বাজাইতে বলিতেন। আমি বাজাইতাম, আর তিনি তন্ময় হইয়া শুনিতেন।

"ভারতীর প্রথম বর্ষে 'সম্পাদকের বৈঠকে' 'গঞ্জিকা' নামে একটা বিভাগ ছিল। তাহাতে কেবল ব্যঙ্গকৌতুকের কথাই থাকিত। এইভাগে বড়দাদাই প্রায় সব লিখিতেন। আমি "ঊনবিংশ শতাব্দীর রামায়ণ বা রামিয়াড্" নামে কেবল একটা নক্সা লিখিয়াছিলাম মাত্র। আমি তখন অনেক বিষয়েই লিখিতাম। প্রথম বর্ষের "ভারতী"তে রবি ও অক্ষয়ের লেখাই বেশী প্রকাশিত হইয়াছিল। "ভারতী"তে রবির "মেঘনাদবধ" কাব্যের সমালোচনা ও কবিতা প্রথম বাহির হয়। অক্ষয় তখন বঙ্গসাহিত্যের সমালোচনা এবং হৃদয়-ভাবের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া এক একটি প্রবন্ধ লিখিতেন, যেমন "মান ও অভিমানে কি প্রভেদ ?" ইত্যাদি। লোকের এ সব তখন খুবই ভাল লাগিত।"

ভারতীর দ্বিতীয় বর্ষ হইতে, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনায় পত্রিকার অনেক পৃষ্ঠা পূর্ণ হইতে আরম্ভ করিল। "ছিন্নমুকুল" "মালতী" "গাথা" এবং "পৃথিবীর" বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য প্রবন্ধগুলি সব ভারতী হইতেই পুনর্মুদ্রিত।

অক্ষয়বাবুর কথায় জ্যোতিবাবু বলিলেন, "অক্ষয় M. A. B. L. পাশ করিয়া এটর্ণি হইয়াছিলেন। বিধাতার বিড়ম্বনা আর কি! তাঁহার মত শিশুর ন্যায় সরল, বিশ্বাসপ্রবণ, ভাবুক এবং আসল কবি-মানুষ কি কখনও সংসারকার্য্যে উন্নতিলাভ করিতে পারে? তিনি Shakespeare-এর বড় ভক্ত ছিলেন। বাড়ীর কয়েকটি ছেলেকে তিনি Shakespeare পড়াইতেন। পড়াইতে পড়াইতে, ভাবাশ্রুতে তাঁহার নিজেরই বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। তিনি যেখানে বসিতেন, সে জায়গাটা চুরুটের ভুক্তাবশেষ ছাই ও দিয়াশলাইয়ের কাঠিতে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। কোনও কল্পনা যদি কখনও তাঁহার মাথায় একবার ঢুকিত, তবে সেটা শীঘ্র বাহির হইতে চাহিত না।

"তাঁহাকে অতি সহজেই April fool করা যাইত। একবার রবি গোঁপ-দাড়ি পরিয়া একজন পার্শী সাজিয়া, তাঁহাকে বড় ঠকাইয়াছিলেন। আমি বলিলাম—বোম্বাই হইতে একজন পার্শী ভদ্রলোক এসেছেন, তোমার সঙ্গে ইংরাজী-সাহিত্য-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চান। অক্ষয় অমনি তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন। রবি ছদ্মবেশী পার্শী হইয়া আসিয়া, তাঁহার সঙ্গে সাহিত্যালোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই রবিকে তিনি কতবার দেখিয়াছেন, কণ্ঠস্বর তাঁহার কত পরিচিত, কিন্তু ঐ যে পার্শী বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে, সে ত শীঘ্র যাইবার নয়! অক্ষয় Byron, Shelley প্রভৃতি আওড়াইয়া খুব গম্ভীর-ভাবে আলোচনা জুড়িয়া দিলেন। অনেকক্ষণ এইরূপ চলিল,

শেষে আমরা আর হাস্যসম্বরণ করিতে পারি না, এমন সময় শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। আসিয়াই তিনি "এ কে ?—রবি ?" বলিয়া রবির মাথায় যেমন এক থাপ্পড় মারিলেন, অমনি কৃত্রিম দাড়ি-গোঁপ সব খসিয়া পড়িল! অক্ষয় অবাক্ হইয়া ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন; তখনও কল্পনার নেশাটা তাঁহার মাথা হইতে যেন সম্পূর্ণ ছুটে নাই!

"আরও দুই একবার আমরা তাঁহাকে এপ্রিল-ফুল্ করিবার মৎলব করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার ঘরের চতুর মন্ত্রীটি তাঁহার অনন্য-সাধারণ বুদ্ধির প্রাখর্য্যে, সববারেই আমাদের ষড়যন্ত্র ভণ্ডুল করিয়া দিয়া-ছিলেন।

"উদাসীন নামে একটি কবিতা অক্ষয়চন্দ্র প্রথম রচনা করেন। ইহা পরে পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল। বইখানির তখন জনসমাজে খুব প্রশংসাও হইয়াছিল। তাহার পর তিনি "ভারত-গাথা" নামে কবিতায় একখানি ইতিহাস লেখেন। ইহাতে আর্য্যদের ভারতে আগমন হইতে, ইংরাজ-রাজত্বের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য প্রায় সমস্ত বিষয়ই সংক্ষেপে কবিতায় বর্ণিত ছিল। এখানি তখন কোনও কোনও বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তকরূপেও নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। অক্ষয় বাঁয়া-তবলা বাজাইতেও বড় ভালবাসিতেন। আসল যন্ত্রের অভাবে, তিনি সময় সময় টেবিলেই কায সারিয়া লইতেন। অনেক সময়ে আমি বেহালা বাজাইতাম, আর অক্ষয় বাঁয়ায় আমার সঙ্গে সঙ্গত করিতেন।"

অক্ষয়চন্দ্র প্রেমের গানই বেশী রচনা করিয়াছিলেন, তাহার দুই একটি নমুনা এখানে দিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না:—

সফর্দা—মধ্যমান

নিতান্ত না রইতে পেরে দেখিতে এলাম আপনি,
দেখ আর না দেখ আমায়, দেখিব ও-মুখখানি।
মনে করি আসিব না এ মুখ আর দেখাব না
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে কেন যে তাহা নাহি জানি।
এসেছ দিব না ব্যথা তুলিব না কোন কথা
সাধিব না, কাঁদিব না, রব অমনি।
যেথা আছ সেথাই থাক আর কাছে যাব না কো
চোখের দেখা দেখব শুধু, দেখেই যাব এখনি॥

বেহাগ—মধ্যমান্

কেনই বা ভুলিব তোমায় কে ভোলে হৃদয়-ধনে
শূন্য হৃদয় লয়ে কি সুখে বাঁচিব প্রাণে?
আশাতে নিরাশা বলে' তোমারে কি যাব ভুলে
সে ত নয় রে ভালবাসা—সুখ আশা সংগোপনে।
রাখিব না সুখ-আশা চাহিব না ভালবাসা
ভালবেসেই সুখী রব মনে মনে।
প্রেমের প্রতিমা খানি দলিত হৃদয়ে আনি
জীবন-অঞ্জলি দিয়ে পূজিব অতি যতনে॥

জ্যোতিবাবু বলিলেন—"এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর-রচনা করিতাম। আমার দুইপার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ, পেন্সিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটি সুর-রচনা করিলাম, অমনি ইঁহারা সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান-রচনা করিতে

লাগিয়া যাইতেন। একটি নূতন সুর তৈরি হইবামাত্র, সেটি আরও কয়েকবার বাজাইয়া ইঁহাদিগকে শুনাইতাম। সেই সময় অক্ষয়চন্দ্র চক্ষু মুদিয়া বর্ম্মা সিগার টানিতে টানিতে, মনে মনে কথার চিন্তা করিতেন। পরে যখন তাঁহার নাক মুখ দিয়া অজস্রভাবে ধূমপ্রবাহ বহিত, তখনি বুঝা যাইত যে এইবার তাঁহার মস্তিষ্কের ইঞ্জিন চলিবার উপক্রম করিয়াছে। তিনি অমনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া চুরুটের টুক্‌রাটি, সম্মুখে যাহা পাইতেন এমন কি পিরানোর উপরেই, তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিয়া হাঁফ্‌, ছাড়িয়া, "হয়েছে হয়েছে" বলিতে বলিতে আনন্দদীপ্ত মুখে লিখিতে সুরু করিয়া দিতেন। রবি কিন্তু বরাবর শান্তভাবেই ভাবাবেশে রচনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথের চাঞ্চল্য ক্কচিৎ লক্ষিত হইত। অক্ষয়ের যত শীঘ্র হইত, রবির রচনা তত শীঘ্র হইত না। সচরাচর গান বাঁধিয়া তাহাতে সুর-সংযোগ করাই প্রচলিত রীতি, কিন্তু আমাদের পদ্ধতি ছিল উল্টা। সুরের অনুরূপ গান তৈরি হইত।

"স্বর্ণকুমারীও অনেক সময় আমার রচিত সুরে গান প্রস্তুত করিতেন। সাহিত্য এবং সঙ্গীতচর্চ্চায় আমাদের তেতলা মহলের আবহাওয়া তখন দিবারাত্রি সমভাবে পূর্ণ হইয়া থাকিত। রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রথম রচনা "কালমৃগয়া" * গীতিনাট্য এবং তাঁহার দ্বিতীয় রচনা "বাল্মীকি-প্রতিভা" গীতিনাট্যেও উক্তরূপে রচিত সুরের, অনেক গান দেওয়া হইয়াছিল।"

---

* দশরথ কর্ত্তৃক সিন্ধুমুনির পুত্রবধ আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যখানি রচিত। ইহাই রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রথম পুস্তক। এ নাট্যখানির আর সংস্করণ হয় নাই। আজকাল দুর্ল্লভ।

একদিন জ্যোতিবাবুরা কয়েকজন বন্ধুবান্ধবসহ ষ্টীমারে চন্দননগর যাইতেছিলেন। পথে অকস্মাৎ ঝড় জল তুফান আরম্ভ হইয়া সমস্ত ষ্টীমারখানিকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইঁহাদের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিলনা। জ্যোতিবাবু সুর-রচনা করিতেছিলেন, ও অক্ষয়বাবু ক্রমান্বয় তাহার সঙ্গে একটির পর একটি গান বাঁধিয়া যাইতেছিলেন। ইঁহারা গানবাজনায় একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া গিয়াছিলেন। এই একদিনকার রচিত গানগুলি হইতেই, পরে "মানভঙ্গ" নামে একখানি গীতিনাট্য প্রস্তুত হইয়াছিল। "মানভঙ্গ" প্রথম জোড়াসাঁকো বাড়ীতে অভিনীত হয়। তাহার অনেক দিন পরে, যখন "ভারত-সঙ্গীত-সমাজ" স্থাপিত হয়, তখন জ্যোতিবাবু এই "মানভঙ্গে"র আখ্যান বস্তু লইয়া পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে "পুনর্বসন্ত" নামে আর একখানি গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিল। "পুনর্বসন্ত" সঙ্গীতসমাজে অনেকবার অভিনীত হইয়াছিল। লোকেরও তখন এখানি খুব ভাল লাগিত।

এই সময়ে জোড়াসাঁকো বাড়ীতে জ্যোতিবাবুরা প্রতি বৎসর একটি "সম্মিলনী" আহ্বান করিতেন; উদ্দেশ্য—সাহিত্যসেবীদের মধ্যে যাহাতে পরস্পর আলাপ-পরিচয় ও তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধিত হয়। মহর্ষি যে চারিজন ছাত্রকে বেদ-শিক্ষার জন্য কাশীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদেরই মধ্যে একজন, শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়, এই সম্মিলনের নামকরণ করিয়া দিয়াছিলেন—"বিদ্বজ্জন-সমাগম।" এই 'সমাগমে' তখন বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য-সেবীগণকে নিমন্ত্রণ করা হইত। এই উপলক্ষে অনেক রচনা এবং কবিতাদিও পঠিত হইত, গীত-বাদ্যের আয়োজন থাকিত, নাট্যাভিনয়

প্রদর্শিত হইত এবং সর্ব্বশেষে সকলের একত্র প্রীতিভোজনে এই সাহিত্য-মহোৎসবের পরিসমাপ্তি হইত।

কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের সম্বন্ধে জ্যোতিবাবু একটি মজার গল্প বলিলেন :—

"রাজকৃষ্ণবাবু যখন 'বিদ্বজ্জন-সমাগমে' আসিতেন, তখন তিনি উদীয়মান্ কবি; সবে মাত্র সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বে একবার আমি, গুণুদাদা, আমার ভগ্নীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, ও আমাদের একজন আত্মীয় কেদার, এই কয়জনে পূজার সময় পশ্চিম বেড়াইতে যাইতেছিলাম। মধ্যে কি একটা ষ্টেশনে রোগা, পরণে ময়লা কাপড়, খালি পা, একটি ছোক্‌রা আসিয়া আমাদিগকে বলিল—'আমি মামার বাড়ী যাইব, হাতে পয়সা নাই, যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার ভাড়াটি আপনারা দিয়া দেন ত বড় উপকৃত হই।' যদুবাবু বড় আমুদে লোক ছিলেন। তিনি তামাসা করিতে বড় ভালবাসিতেন, রহস্য করিয়া গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কবিতা টবিতা লিখিতে পার?" বালক অমনি সপ্রতিভভাবে মৃদুস্বরে বলিল "হাঁ পারি।" আমরা ভাবিলাম—লোকটা পাগল নাকি? যদুবাবু অধিকতর কৌতূহলী হইয়া রহস্যচ্ছলে আবার বলিলেন—"তা বাঃ, বেশ বেশ। দেখ, এই কেদার আমায় আমার প্রেয়সী 'তারা'র নিকট হইতে, ছিনাইয়া লইয়া চলিয়াছে! বল ত বাপু, এমনি করিয়া কি ভদ্রলোককে দুঃখ দিতে হয়? তুমি এই বিষয়ে একটি কবিতা আমায় লিখিয়া দাও দেখি!" বালক তৎক্ষণাৎ একখানি চোতা কাগজে পেন্সিল দিয়া ফস্ ফস্ করিয়া একটা প্রকাণ্ড কবিতা লিখিয়া ফেলিল। তাহার প্রথম দুই ছত্র এখনও আমার মনে আছে :—



স্বর্গীয় কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়

"কেদার দেদার দুখ দিলেন আমায়
তারা ধনে হারা করে' আনিয়া হেথায়।" ইত্যাদি।

আমরা জানিতাম না, এই বালকই তখনকার উদীয়মান কবি রাজকৃষ্ণ রায়। আজ বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি—তাঁহার রচিত নাটক এখনও কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। তাঁহার গ্রন্থাবলী বঙ্গ-সাহিত্যে আদরের বস্তু।"

জোড়াসাঁকো বাড়ীতে "কাল-মৃগয়া" অভিনয়কালে, রবিবাবু অন্ধ মুনি ও জ্যোতিবাবু দশরথের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। "বাল্মীকি-প্রতিভা"য় জ্যোতিবাবু কোনও পাঠ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার উপর সঙ্গীত ও কন্‌সার্টের ভার ছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত হাস্যরসিক অক্ষয় মজুমদার মহাশয় "বাল্মীকি-প্রতিভা"য় ডাকাতের সর্দ্দার সাজিতেন। তাঁহার অভিনয়ভঙ্গীতে লোক হাসিয়া গড়াগড়ি যাইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অক্ষয়বাবুর ন্যায় হাস্যরসের অভিনেতা তখন আর কেহই ছিল না। সকল অভিনয়েই Comic অংশটি তাঁহার একচেটিয়া থাকিত।

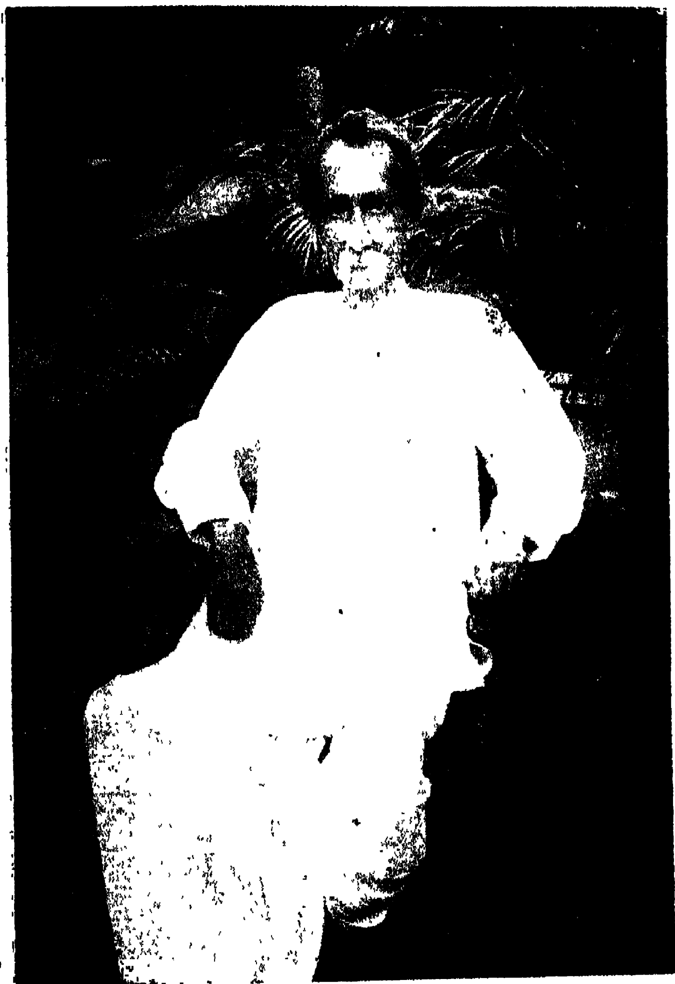
ইহার কিছু পরে, একদিন তদানীন্তন লাটসাহেবের পত্নী লেডী ল্যান্সডাউন (Lansdowne) ও অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ও সাহেবদিগকে জোড়াসাঁকো বাড়ীতে "বাল্মীকি-প্রতিভা" অভিনয়-দর্শনে নিমন্ত্রণ করা হয়। বাঙ্গালীদের মধ্যে স্বর্গীয় মহাত্মা স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও ছিলেন। রবিবাবু বাল্মীকি, হেমেন্দ্রনাথের বালিকাকন্যা প্রতিভা সরস্বতী, এবং বাড়ীর অন্যান্য বালিকারা বনদেবী সাজিয়াছিলেন। অভিনয়-পারিপাট্যে ও গানে সকলেই খুব প্রীত হইয়াছিলেন। ঝড় বৃষ্টির একটা দৃশ্য ছিল—তাহাতে সত্যসত্যই ঝর্ ঝর্ করিয়া যখন জলধারা পড়িয়াছিল, তখন অনেকেরই তাহা প্রকৃত বৃষ্টিধারা বলিয়া ভ্রম উৎপাদন করিয়াছিল। লেডী ল্যান্সডাউন্ অভিনয়

দর্শন করিতে করিতে অক্ষয় মজুমদারকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্ট একজন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "He is my man" এই কথা শুনিয়া অক্ষয়বাবু পরে খুব গৌরব অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি অনেক সময় রহস্য করিয়া বলিতেন "জান ত, লেডী ল্যান্সডাউন্ আমাকে কি বলিয়াছেন? আমি যে-সে, বড় কেউ-কেটা নই!"

প্রথম যখন ইঁহাদের বাড়ীতে "বাল্মীকি-প্রতিভা" অভিনয় হয়, তখন জ্যোতিবাবু নূতন শিকারী; বন্দুক-চালনা প্রভৃতিতে তখন তাঁহার প্রবল ঝোঁক; অভিনয়-উপলক্ষে তিনি নিজেই শিকার করিতে বাহির হইলেন, সত্যিকারের একটা পাখী অভিনয়ে দেখাইবেন, এই অভিপ্রায়। কিন্তু বিধাতার এমনি পরিহাস যে, সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তবু একটা পাখীও মারিতে পারিলেন না। শেষে সন্ধ্যার পর হতাশ হইয়া যখন বাড়ী ফিরিতেছিলেন তখন দেখিলেন যে, এক ব্যক্তি কতকগুলি জীবন্ত বক লইয়া যাইতেছে। তাহার নিকট হইতে তিনি দুইটি বক ক্রয় করিয়া, পথে মারিয়া বাড়ী আনেন—তাহাই অভিনয়ে প্রদর্শিত হইয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত সকলেই জানেন যে, সেই ক্রৌঞ্চমিথুন জ্যোতিবাবু শিকার করিয়াই আনিয়াছিলেন। শিকার-পর্ব্বের এই একটি গুপ্ত অধ্যায় আজ প্রকাশ হইয়া পড়িল।

অন্যান্য ঝোঁক গিয়া এই সময়ে জ্যোতিবাবুর শিকারের ঝোঁকটাই খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতি রবিবারে সদলবলে তিনি শিকারে বাহির হইতেন। এই দলে মেট্রোপলিটান্ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্রজনাথ দে, রবীন্দ্রনাথ ও আরও অনেক লোক আসিতেন। বাটী হইতে প্রচুরপরিমাণে খাদ্যাদি লইয়া, ইঁহারা প্রায়ই প্রভাতে শিকারে বহির্গত হইতেন। শিকারের জায়গা ছিল ধাপার মাঠ। . . . . . .

একদিন শিকার করিয়া ফিরিবার পথে, একটা কাহার



স্বর্গীয় স্যর. গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁগানে দেখিতে পাইলেন বেশ সুন্দর ডাব রহিয়াছে। যে হেতু উদ্যান-স্বামী অজ্ঞাত, সেই কারণে সকলেরই ডাব খাইতে ইচ্ছা হইল। ব্রজবাবু বাগানে ঢুকিয়াই গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ওরে মালী, মামা কই?" মালি ভাবিল, ইনি তবে বুঝি তাহার মালিকেরই ভাগিনেয়। সে সকাতরে এবং সসম্ভ্রমে বলিল, "তিনি ত আসেন নাই।" ব্রজবাবু একটু চিন্তার ভাণ করিয়া কহিলেন—"তাইতো, মামা একেবারেই আসেন নাই?" মালী জোড়করে নিবেদন করিল—"এজ্ঞে না।" "বটে? তবে আর কি হবে? আচ্ছা, কয়টা ডাব পাড়্ দেখি।" মালী শশব্যস্তে তৎক্ষণাৎ আজ্ঞাপালন করিল, এবং সকলে মিলিয়া, সেগুলির অবিলম্বে সদ্ব্যবহার করিলেন। গমনকালে তাঁহারা দেখিলেন যে, বৃক্ষশীর্ষে উক্ত ফল, সেই অজ্ঞাত মাতুল মহাশয়ের ভোগের জন্য আর অতি অল্পমাত্রই অবশিষ্ট রহিল।

বাঙ্গালীদের মধ্যে সৎসাহস বর্দ্ধিত করিবার জন্য, জ্যোতিবাবু এই বন্দুক-ছোঁড়া ও শিকারের প্রবর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কবি অক্ষয়চন্দ্রকে কিছুতেই এবার তাঁহার দলে ভিড়াইতে পারেন নাই। একদিন জ্যোতিবাবু অক্ষয়বাবুকে ধরিয়া বসিলেন, 'তোমাকে আজ বন্দুক ছুঁড়িতেই হইবে।' অক্ষয়বাবু ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ, তালু শুষ্ক, এবং দেহ মূর্চ্ছিত হইয়া আসিতে লাগিল; কিন্তু জ্যোতিবাবু ছাড়িবার পাত্র নহেন—অক্ষয়বাবু প্রমাদ গণিলেন। কি করিবেন, উপায় নাই! সমূহ বিপদ, নিরুপায় হইয়া তিনি শেষে চক্ষু বুঁজিয়া কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মত দাঁড়াইলেন, আর জ্যোতিবাবু তাঁহার হাত ধরিয়া বন্দুকের ঘোড়াটি টিপাইলেন। অনেকের ভয়ই এমনি করিয়া ভাঙ্গিয়াছিল, অনেকেই কিছু কিছু শিখিয়াও ছিল, কিন্তু অক্ষয়চন্দ্রের ভয়ের ক্ষয় আর হইল না, এততেও না।

শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠার উদ্যম, "ভারতী" ও "বালক" এবং সারস্বত-সম্মিলনী

এই সময়ে জ্যোতিবাবুর উদ্যোগে আর একটি সভা স্থাপিত হইয়াছিল। এই সভার নাম ছিল, "সঞ্জীবনী-সভা"। ছেলেবেলাকার সেই Masonic সভার, ইহা একটি দ্বিতীয় সংস্করণ! ঠন্‌ঠনের একটা পোড়ো বাড়ীতে এই সভা বসিত। এ বাড়ীতে পূর্ব্বে নাকি একটা স্কুল ছিল, জ্যোতিবাবুরা শুনিয়াছিলেন; কিন্তু এ বাড়ীর যে কে মালিক, তাহা তাঁহারা তখন ত জানিতেনই না, আজ পর্য্যন্তও জানেন না। সভার অধ্যক্ষ ছিলেন, বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু। কিশোর রবীন্দ্রনাথও এ সভার সভ্য ছিলেন। পরে নবগোপাল বাবুকেও সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল। সভার আস্‌বাবপত্রের মধ্যে ছিল, ভাঙ্গা ছোট টেবিল একখানি, কয়েকখানি ভাঙ্গা চেয়ার ও আধখানা ছোট টানা-পাখা—তারও আবার একদিক ঝুলিয়া পড়িয়াছিল।

জাতীয় হিতকর ও উন্নতিকর সমস্ত কার্য্যই এই সভায় অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যেদিন নূতন কোনও সভ্য এই সভায় দীক্ষিত হইতেন, সেদিন অধ্যক্ষ মহাশয় লাল পট্টবস্ত্র পরিয়া সভায় আসিতেন। সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান ছিল, মন্ত্রগুপ্তি; অর্থাৎ এ সভায় যাহা কথিত হইবে, যাহা কৃত হইবে, এবং যাহা শ্রুত হইবে, তাহা অ-সভ্যদের নিকট কখনও প্রকাশ করিবার কাহারও অধিকার ছিল না।

আদিব্রাহ্মসমাজ-পুস্তকাগার হইতে লালরেশমে জড়ান' বেদমন্ত্রের একখানা পুঁথি, এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুই পাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষুকোটরে দুইটি মোমবাতি বসান' ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে, মৃত ভারতের প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাঁহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ ব্যাপারের ইহাই মূল কল্পনা। সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত—"সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্"। সকলে সমস্বরে এই বেদমন্ত্র গান করার পর, তবে সভার কার্য্য—(অর্থাৎ কি না গল্প-গুজব)—আরম্ভ হইত। কার্য্যবিবরণী জ্যোতিবাবুর উদ্ভাবিত এক গুপ্ত ভাষায় * লিখিত হইত। এই গুপ্ত ভাষায় "সঞ্জীবনী সভা"কে "হাঞ্চ্ পামূ হাফ্" বলা হইত।

জ্যোতিবাবু বলিলেন—"ইহার দীক্ষা-অনুষ্ঠানে একটা ভীষণ-গাম্ভীর্য্য ছিল। দীক্ষাকালে, নবদীক্ষার্থীর সর্ব্বাঙ্গ একটা অজ্ঞাত ভাবাবেশে শিহরিয়া উঠিত।

* সঞ্জীবনী সভা কর্ত্তৃক ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক ভাষার উদ্ধার কৌশল নিম্নে লিখিত হইল :—

আকার স্থানে অকার, অকার স্থানে আকার, ই স্থানে উ, ঈ স্থানে ঊ, উ স্থানে ই, ঊ স্থানে ঈ, এ স্থানে ঐ, ঐ স্থানে এ, ও স্থানে ঔ, ঔ স্থানে ও। ক খ গ ঘ স্থানে যথাক্রমে গ ঘ ক খ, চ ছ জ ঝ স্থানে যথাক্রমে জ ঝ চ ছ, ট ঠ ড ঢ স্থানে যথাক্রমে ড ঢ ট ঠ, ত থ দ ধ স্থানে যথাক্রমে দ ধ ত থ, প ফ ব ভ স্থানে যথাক্রমে ব ভ প ফ, শ ষ স স্থানে হ, হ স্থানে স, র স্থানে ল, ল স্থানে র, ম স্থানে ন, ন স্থানে ম। যথা :—

স ন্ জী ব নী স ভা

হা ম্ চূ পা মূ হা ফ্

"প্রথম প্রথম সভার কায পূরা দমেই চলিতে লাগিল। নিত্য নূতন প্রস্তাব গৃহীত হইত, কিন্তু কাযে পরিণত করা পর্য্যন্ত ধৈর্য্য কোনও বিষয়েই বড় কাহারও থাকিত না। যাহার যেরূপ কল্পনা খেলিত, সে সেইরূপই প্রস্তাব করিত। এইরূপ কাল্পনিক সুখে এক রকম দিন বেশ কাটিয়া যাইতেছিল।

"একদিন সভায় আমি প্রস্তাব করিলাম যে, ভারতবর্ষে সার্ব্বজাতিক ঐক্য-সাধন করিতে গেলে, একটা সার্ব্বজনিক পোষাক হওয়া আবশ্যক। এ প্রস্তাবটি সকলে একবাক্যে অনুমোদন করিলে, ভারতের আন্তর্জাতিক ভাবী ঐক্য-বিধায়ী, সার্ব্বভৌম মিলনোপযোগী পোষাকের পরিকল্পনা করার ভার পড়িল আমারই উপর। শেষে স্থির হইল যে, মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরিলে যেমন হয়, ঐরূপ একটা পোষাক ও মাথায় যাহাতে রৌদ্র-বৃষ্টি না লাগে এইরূপ একটা শোলার টুপির উপর পাগড়ী বসাইয়া একটা শিরস্ত্রাণ, বেশ সার্ব্বজনীন পরিচ্ছদরূপে গৃহীত হইতে পারে। সকলেই সোৎসাহে মহাকলরব করিয়া এবং বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীতে বলিল—'ঠিক ঠিক।' আমার অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তির প্রশংসায় সভা-গৃহে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। কেহ বাচনিক তারিফ্ করিল, কেহ মানসিক নীরবে বিমুগ্ধ অন্তরে প্রশংসা করিল, এবং কেহ বা কায়িকভাবে ঘনঘন প্রচণ্ড চপেটাঘাতে আমার পিঠ ঠুকিয়া দিয়া, আমায় অভিনন্দন করিল। তৎক্ষণাৎ দর্জ্জির দোকানে গিয়া, মালকোঁচা-মারা কাপড় শেলাই ও পূর্ব্বোক্তরূপ শিরস্ত্রাণ প্রস্তুত করিতে হুকুম দেওয়া হইল। যথাকালে পোষাক প্রস্তুত হইয়া আসিল; কিন্তু এ অভিনব পোষাক পরিয়া প্রথমে পথে বাহির হইবে কে? আমিই প্রথম বাহির হইব। একদিন মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে সার্ব্বজনিক ঐক্য-

সাধক এই পোষাক পরিয়া, আমি কলিকাতা সহর ঘুরিয়া আসিলাম। লোকে এ পোষাকের অন্তর্গূঢ় হিতকর উদ্দেশ্য বুঝিল না কেবল পরিহাস-বিদ্রূপই করিল, কিন্তু আমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিলাম না।” কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন “দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সার্ব্বজনীন পোষাক পরিয়া, গাড়ী করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে, এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল।”

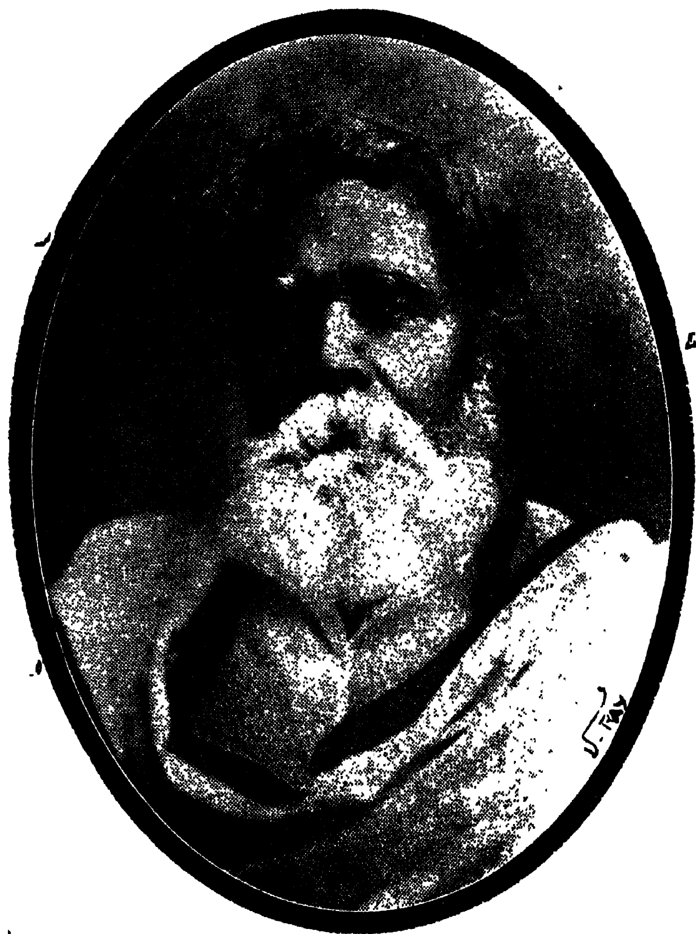
“একমাত্র আমি ছাড়া, কেহই এ পোষাক কখনও পরিধান করেন নাই। সভ্যগণ যখন দেখিলেন যে, আন্তর্জাতিক পোষাক দেশের কেহই গ্রহণ করিল না, তখন অগত্যা এ কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা দেশে শিল্পবাণিজ্যের কল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইলাম। সর্ব্বপ্রথম দিয়াশলাইয়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইল। অনেক আয়াসে এবং বহু অর্থব্যয়ে কয়েক বাক্স দিয়াশলাই প্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু এ পদার্থ সাধারণের পক্ষে ক্রয়সাধ্য বা ব্যবহারের মোটেই উপযোগী হইল না। একেত খরচ খুব বেশী পড়িত, তাহা ব্যতীত দেশে কাঠির অভাব, সেজন্য যে-সে কাঠের কাঠি ব্যবহৃত হওয়াতে দিয়াশলাই শীঘ্র জ্বলিতও না। এই জন্য লোকে এই দিয়াশলাই পছন্দ করিত না। যখন পদে পদে এইরূপ অসুবিধা হইতে লাগিল, তখন সভ্যগণ দেখিলেন যে, এ অসাধ্য-সাধনে সময় নষ্ট করা অপেক্ষা, দেশের অন্য কোনও সহজসাধ্য মঙ্গলকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করাই উচিত।

“এই সুযুক্তির ফলে, সভায় এক নূতন কাপড়ের কল আনানো হইল। আবার প্রবলভাবে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা সুরু হইল। সভ্যদেরও উদ্যম আবার দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। সভায় ইহাও স্থির

হইল যে, ভবিষ্যতে আরও কয়েকখানি তাঁত বসাইতে হইবে, এবং এজন্য একখানি বাড়ীও প্রস্তুত করিতে হইবে। সভ্যেরা চাঁদা দিতেন, তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ। এইরূপে যে সামান্য কিছু টাকা জমিয়াছিল, তাহাতেই এইরূপ এক বিরাট কল্পনা করা হইল। দেখিতে দেখিতে নবপ্রতিষ্ঠিত কাপড়ের কলে একদিন একখানি গামছা প্রস্তুত হইল। ব্রজবাবু সেই গামছাখানি মাথায় বাঁধিয়া উন্মত্তের মত তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিয়া দিলেন। সভার সে এক স্মরণীয় দিন! একে একে প্রায় সকল সভ্যই শেষে তাঁহার সঙ্গে নৃত্যে যোগ দিলেন। তারপর কল উঠিয়া গেল। এই গামছাখানি ছাড়া, অন্য আর কিছুই সে কলে প্রস্তুত হয় নাই।

"এই "সঞ্জীবনী-সভা"র সভ্যগণের মধ্যে জাতিবর্ণনির্ব্বিচারে আহারেরও একটি বিধি ছিল। আমাদের মধ্যে নানা জাতিবর্ণের লোক ছিল। কুলীন ব্রাহ্মণ হইতে শুঁড়ী পর্য্যন্ত।

"কোন এক ব্রাহ্মণ জমিদার-সভ্যের গঙ্গার ধারের একটি বাগান-বাড়ীতে একবার আমাদের একটা প্রীতি-ভোজ হয়। জমিদার সভ্যটি একটু নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইলেও, তিনি সভার সভ্যদিগের সঙ্গে একত্র আহারাদি করিতে একেবারেই কুণ্ঠিত হইলেন না। বোধ হয়, তিনি সভার গণ্ডীকে জগন্নাথ-ক্ষেত্রেরই সামিল মনে করিতেন। খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে খুব এক ঝড় উঠিল। রাজনারায়ণ বাবু সেই সময় গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া, চিৎকার করিয়া "আজি উন্মদ পবনে—" বলিয়া রবীন্দ্রনাথের নবরচিত একটি গান আরম্ভ করিয়া দিলেন। ক্রমে ক্রমে সকল সভ্যই তাঁহার সঙ্গে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী-সহকারে, দারুণ উৎসাহ-ভরে সেই গানে যোগ দিলেন। জলঝড়ের মাতামাতির চেয়ে আমাদের মাতামাতিই তখন বেশী ছিল।"



স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু

জ্যোতিবাবু বলিলেন,—"রাজনারায়ণবাবু আমাদের চেয়ে বয়সেও যেমন অনেক বড়, জ্ঞানেও তেমনি অনেক বড় ছিলেন; কিন্তু তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়, গর্ব্বশূন্য প্রাণ, এবং স্বদেশের জন্য ঐকান্তিকতা, তাঁহাকে একেবারে শিশুর মত সরলতার একখানি প্রতিমা করিয়া রাখিয়াছিল। বয়সের এমন পার্থক্য ও এত প্রচুর পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও, তাঁহার মনে কখনও বিন্দুমাত্র অভিমান আমি দেখি নাই। রাজনারায়ণবাবু আমার পিতৃদেবের নিকট গিয়া যেমন গভীর জটিল ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করিতেন, বড় দাদার সঙ্গে যেমন দর্শনশাস্ত্রের কূট তর্ক করিতেন, আমাদের সঙ্গে তেমনি হাসিমুখে ছেলেমানুষিও করিতেন। তাঁহার মত এমন অসাধারণ মানুষ, আমি আর দেখি নাই। তাঁহার অনেক হাসির গল্প পুঁজি ছিল—তিনি ঐরূপ এক একটি গল্প বলিয়া, মুদ্রিত নেত্রে মজাটি কিছুক্ষণ নিজেই উপভোগ করিয়া—দুই এক সেকেণ্ড স্তম্ভিত থাকিয়া, নিজেই উচ্চরবে সকলের আগে হাসিয়া উঠিতেন। সেই খোলা উচ্চহাসির মধ্যে একটি সুমধুর সরলতা এবং একটা নিরভিমান বিরাট প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হইত।

"তাঁহার রচিত 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' তখনও প্রকাশিত হয় নাই। আমাদের পূজার দালানে, এখন যেখানে উপাসনা হয় সেইখানে, একবার একটি সভা হইয়াছিল। আমার পিতা ছিলেন সভাপতি; রাজনারায়ণবাবু সেই সভায় "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য লোক সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। রাজনারায়ণ বাবুর প্রবন্ধ পঠিত হইলে, রেভারেণ্ড কালীচরণ তাহার এক তীব্র প্রতিবাদ করেন। পিতাঠাকুর মহাশয় তাহাতে এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি আসনত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া-

ছিলেন,—তখন তাঁহাকে আবার অনেক বলিয়া কহিয়া, বসাইয়া রাখা হয়।

"রাজনারায়ণ বাবু যখন "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" বক্তৃতাটিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, তখন আমি নানা ফরাসী গ্রন্থ হইতে তাঁহার মতের পোষক অনেক রচনা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম। উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে যে সমস্ত ফরাসী অংশ উদ্ধৃত আছে, সেগুলি আমারই সঙ্কলিত।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ভারতীর সম্পাদকতা ছাড়িয়া দিবার কিছুদিন পরে, রবীন্দ্রনাথ ছেলেদের জন্য "বালক" নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত করেন। ইহাতে তখন জ্যোতিবাবু physiognomy (মুখসামুদ্রিক) ও phrenology (শিরসামুদ্রিক) বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। "বালকে" প্রতিকৃতিসহ শিরসামুদ্রিক অনুসারে স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজনারায়ণবাবু প্রভৃতি মহাত্মাগণের চরিত্রসমালোচনা বাহির হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু ও রাজনারায়ণবাবুর ছবি জ্যোতিবাবুর স্বহস্তাঙ্কিত পেন্সিল স্কেচ্ হইতেই মুদ্রিত হইয়াছিল।

এই সময়ে জ্যোতিবাবু একবার গাজীপুরে গিয়াছিলেন। সেখানে জেলের ডাক্তার Robertson সাহেবের সঙ্গে তাঁহার খুব আলাপ হইয়াছিল। এই রবার্টসন্ সাহেব পরে গিল্‌গিট্ দেশে গিয়া রাষ্ট্রনৈতিক কৃতিত্ব দেখাইয়া নাইট্ (Knight) উপাধি প্রাপ্ত হন। জ্যোতিবাবু তাঁহার মাথা দেখিয়া ও চরিত্রবর্ণনা করিয়া, একখানি কাগজে তাঁহার চরিত্রবিবরণ লিখিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি জ্যোতিবাবুর উপর খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এইখানে জ্যোতিবাবু সাহেবের অনুমতি অনুসারে, জেলের সব বেড়ি-পায়ে দাগী বদ্‌মাইস্ কয়েদীদেরও



রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (মধ্যবয়সে)

ছবি আঁকিয়া মাথা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। গাজীপুরে অবস্থান কালে কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে তাঁহার প্রথম আলাপ হয়।

জ্যোতিবাবুর অনেক বন্ধুবান্ধবও তাঁহাকে দিয়া মাথা দেখাইতেন। ইহাতে তাঁহাদের মাথা টিপাইবার কাযও অনেকটা হাসিল হইত। স্যার তারকনাথ পালিত মহাশয় কখনও কখনও বলিতেন, "ভাই জ্যোতি, আমার মাথাটা একবার দেখ' ত!" এইরূপে জ্যোতিবাবুর দ্বারা অনেক সময়ে তিনি মাথা টিপাইয়া লইতেন।

জ্যোতিবাবু পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একবার মাথা দেখিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের চরিত্র, বর্ণনার সঙ্গে মিলাইয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বভাবের সহিত এই বর্ণনা অনেকটা মেলে বটে। শেষে তিনি জ্যোতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আচ্ছা, ফ্রেনলজিতে তোমার কি খুব বিশ্বাস?—ফ্রেনলজির সব কথাই কি ঠিক?"—জ্যোতিবাবু বলিয়াছিলেন, "আমি ফ্রেনলজিষ্টদের সব কথা বিশ্বাস করিনে,—তবে মোটামুটি কতকটা মেলে—এই মাত্র।"—

"তুমি যে ফ্রেনলজির গোঁড়া ভক্ত নও,এ কথা শুনে ভারি খুসী হলেম।" এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে অনেক সাধুবাদ করিয়াছিলেন।

জ্যোতিবাবু একবার "ইণ্ডিয়ান মিরারে"র সম্পাদক ৺নরেন্দ্রনাথ সেনের মাথা দেখিয়া, তাঁহার চরিত্র-বিবরণ লিখিয়া দিয়াছিলেন। জ্যোতিবাবু বলিয়াছিলেন, "তাঁহার ক্রোধ হইলে, তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন।" এই কথায় সেনমহাশয় বলিয়াছিলেন, "আপনি বোধ হয় একথা আর কারও কাছে শুনিয়াছেন?"—কিন্তু যখন শুনিলেন যে, জ্যোতিবাবুর নিকট এ সংবাদ এতদিন একেবারেই অবিদিত ছিল, তাঁহার মাথা দেখিয়াই তিনি একথা বলিতেছেন, তখন নরেন্দ্রবাবু অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন।

("বালক" এক বৎসর মাত্র চলিয়াছিল, তাহার পর "ভারতী"র সঙ্গে মিলিয়া "ভারতী ও বালক" নামে বাহির হয়।)

আবার জ্যোতিবাবু আর একটি সভা স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলেন। এবারে আর দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধনের জন্য নহে, এবার বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির জন্য। সভার নাম হইল "কলিকাতা সারস্বত-সম্মিলনী।" সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তিনটি। প্রথম, বঙ্গ-ভাষার অভাবমোচন; দ্বিতীয়, বঙ্গীয় গ্রন্থসমালোচনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতিসাধন ও উৎসাহবর্দ্ধন; এবং তৃতীয়, বঙ্গসাহিত্যানুরাগীদিগের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্দ-স্থাপন। এই সভা স্থাপন-কালে তাঁহার রচিত অনুষ্ঠানপত্র ও নিয়মাবলীর কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

"বিদ্বজ্জনগণের একত্র সম্মিলনের অনেকগুলি শুভফল আছে:—

(১) সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরস্পর দেখাশুনা হয়, ও সৌহার্দ্দ জন্মে।

(২) পরস্পরের মধ্যে ভাবের ও মতের আদানপ্রদান হওয়ায়, একদেশদর্শিতা ঘুচিয়া যায় ও উদারতার বৃদ্ধি হয়।

(৩) এই বিদ্বজ্জন-সম্মিলনের উপলক্ষ্যে, আমাদের বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে বহুবিধ শুভ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। যথা—

(ক) বঙ্গভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শনের অনুশীলন করিতে হইলে যে সকল নূতন কথাসৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তাহা আলোচিত ও নির্দ্ধারিত হইতে পারে এবং তৎসঙ্গে বঙ্গভাষায় সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ একখানি অভিধানও সঙ্কলিত হইতে পারে।

(খ) বিদেশীয় ভাষার শব্দসমূহ বাঙ্গলা অক্ষরে প্রকাশ করিতে হইলে, নূতন যে সকল অক্ষরের আবশ্যক হয়, তাহা সৃষ্টি করিয়া প্রচলিত করা যাইতে পারে।



কবিবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন M. A. B. L.

(গ) বাঙ্গলা গ্রন্থের নিরপেক্ষ ও যথাযোগ্য সমালোচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধন হইতে পারে।

(ঘ) সুলেখকদিগকে সভা হইতে যথোপযুক্ত সম্মান দেওয়া যাইতে পারে।

(৪) প্রবন্ধ বা পুস্তক রচনা করিয়া অথবা সংবাদপত্র বা সন্দর্ভ-পত্রের সম্পাদকতা করিয়া যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলনে বিশেষ অনুরাগী, তাঁহারাই এই সভায় সভ্য হইতে পারিবেন।

(৫) বাঙ্গলায় গ্রন্থাদি না লিখিলেও যাঁহাকে সভ্যগণ সারস্বত সভার যোগ্য বিবেচনা করিবেন, অর্থাৎ যাঁহার দ্বারা সভার উদ্দেশ্য-সাধনে সাহায্য হইতে পারিবে, তাঁহাকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারিবে।

(৬) সভায় বাঙ্গলা গ্রন্থসমূহ বঙ্গভাষায় সমালোচিত হইবে, অথবা ভারতবর্ষসংক্রান্ত কোন বিষয়ক প্রবন্ধ বা গ্রন্থ, অন্য ভাষায় রচিত হইলে সভায় তাহারও সমালোচনা হইতে পারিবে।

(৭) যে সকল সমালোচ্য গ্রন্থ সভায় উপস্থিত হইবে, সম্পাদক তাহা সভা-সমক্ষে উপস্থিত করিলে, সভাপতি তাহার সমালোচক স্থির করিয়া দিবেন।

(৮) যে অধিবেশনে পুস্তকের সমালোচনা পাঠ হইবে—তাহার পরের অধিবেশনে সমালোচনা-লিখিত তর্কবিতর্কের সারাংশ ও সমালোচ্য গ্রন্থখানি সম্বন্ধে সভাপতি তাঁহার নিজ মত সংক্ষেপে ব্যক্ত করিবেন।

(৯) সভার অন্যান্য কার্য্যবিবরণের সহিত লিখিত সমালোচনার সংক্ষিপ্তসার ও তর্কবিতর্কের সারাংশ এবং তৎসম্বন্ধে সভাপতির অভিপ্রায় সাধারণের অবগতির জন্য কোন প্রসিদ্ধ সন্দর্ভপত্রে প্রকাশিত হইবে।

সভায় যে কোনও মত ব্যক্ত হইবে, তাহা সভার মত বলিয়া গৃহীত না হইয়া ব্যক্তিগত মত স্বরূপে গৃহীত হইবে।

(১০) সমালোচনা প্রভৃতি কার্য্য না থাকিলে অথবা কার্য্য শেষ হইয়াও যথেষ্ট অবসর থাকিলে, সভ্যদিগের মধ্যে কেহ সভার নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয় সম্বন্ধে পাঠ অথবা মৌখিক বক্তৃতা বা পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারিবেন, ও তাহা লইয়া বাদানুবাদ চলিতে পারিবে। সমালোচনা, প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতাদির কায না থাকিলে, সঙ্গীতাদি হইতে পারিবে।"

যেমন এই কল্পনা জ্যোতিবাবুর মাথায় উদয় হইল, অমনি রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া তিনি স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পরামর্শ লইতে গেলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—'তোমরা বড়মানুষের ছেলে, কোনও বদ্-খেয়ালি না করিয়া এই সব লইয়া যদি সময় কাটাও, ত' সে ভালই। কিন্তু, বাবা, একটা কথা আমি তোমাদের বলিয়া দিতেছি। বড় বড় হোম্‌রা-চোম্‌রা লোকদের ইহার মধ্যে লইও না—তাহা হইলেই সব মাটি হইয়া যাইবে।'

"আমরা কিন্তু হোম্‌রা-চোম্‌রা লোক লইয়াই কায আরম্ভ করিলাম। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় হইলেন আমাদের প্রথম সভাপতি। ভূগোলের ইংরাজী শব্দের পরিভাষা তিনি নিজেই লিখিতে সুরু করিয়া দিলেন। দুই তিন অধিবেশন পর্য্যন্ত বেশ কায চলিয়াছিল—কিন্তু তাহার পরেই, নানা কারণে সভা বন্ধ হইয়া গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সকল প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণই এ সভার সভ্য ছিলেন। বঙ্কিমবাবু এ সভার নাম ইংরাজীতে "Academy of Bengali Literature" রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।"



স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র C. I. E.

*শিকার, নীলের চাষ ও ষ্টীমার-পরিচালনা

তখন জ্যোতিবাবু মধ্যে মধ্যে পাবনা কুষ্টিয়া অঞ্চলে জমিদারি পরিদর্শনের জন্য যাইতেন। এবং শিলাইদহের কুঠীতে গিয়া বাস করিতেন। বিষয় কর্ম্মের অবকাশে, প্রায়ই তিনি পাখী শিকার করিয়া আত্মবিনোদন করিতেন। তবে, নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু দেখা গেলে তাঁহাকে যেন খবর দেওয়া হয়, বলা থাকিত। একদিন শিকারী আসিয়া খবর দিল—নিকটেই একটা জঙ্গলে বাঘ আসিয়াছে। তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। জ্যোতিবাবু শিকারীকে সঙ্গে লইয়া একটা দু-নলী বন্দুকহস্তে পদব্রজে সেই জঙ্গলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রবিবাবুও দাদার পিছনে-পিছনে চলিলেন। তাঁহার হাতে কোনও অস্ত্র ছিল না। জঙ্গলে পৌঁছিলে, শিকারী বলিল, ঐ বাঁশঝাড়ের উপর উঠিয়া তাক্ করিলে, সুবিধা হইতে পারে। জ্যোতিবাবু জুতা খুলিয়া শিকারীর সঙ্গে কঞ্চির উপর দিয়া-দিয়া বন্দুক-হস্তে বাঁশঝাড়ের মধ্যে উঠিয়া গুলি করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। দৃষ্টাল্পতাহেতু তাঁহার—নাকে চশ্‌মা। শিকারী ফিস্ ফিস্ করিয়া যত বলে "ঐ"—তিনি ততই বলেন—"কৈ ?" অনেকক্ষণ পরে দেখিতে পাইলেন, নীচে বড় বড় ঘাসের ভিতরে একটা জানোয়ারের পিঠের রোঁয়া চিক্‌চিক্ করিতেছে। তিনি সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া উপর্য্যুপরি দুইটি গুলি ছুঁড়িলেন—গুলি বাঘের পৃষ্ঠদণ্ড ভেদ করিল। বাঘটা একটা বিকট গর্জ্জন করিয়া, সেই স্থানের ঘাস-সমেত কতকটা মাটি কামড়াইয়া ধরাশায়ী হইল। তাহার পর বাঁশে ঝুলাইয়া সেই মৃত বাঘটাকে তাঁহাদের লোকজন হাল্লা করিয়া কাছারি বাড়ীতে লইয়া আসিল। তখনও সে সেই ঘাস-সমেত মাটি কামড়াইয়া ধরিয়াছিল।

জ্যোতিবাবু কাছারী-বাড়ীর হাতায় পৌঁছিয়া আর এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলেন। তাঁহার লোকেরা বন হইতে একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ ধরিয়া আনিয়াছে। তাহার মাথায় লাঠি মারায় মাথাটা একবারে থেঁৎলিয়া গিয়াছিল। সে একটা গোটা শেয়াল গিলিয়াছিল। লাঠির আঘাতে অজগর সেই শেয়ালটা উগ্‌রাইয়া ফেলিয়াছে। সেই অর্দ্ধপচিত শেয়ালের দুর্গন্ধে সেখানে তিষ্ঠানো ভার। জ্যোতিবাবু কলিকাতায় ফিরিবার সময় সেই চিতাবাঘের স-মুণ্ড চর্ম্ম ও পিঞ্জরাবদ্ধ সেই জীবন্ত অজগর—এই দুই ভীষণ হিংস্র জীবের হতাবশেষ ও জীবন্ত নমুনা—শিকারের বিজয়নিদর্শনস্বরূপ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। জোড়াসাঁকো বাটীতে কিছুদিন রাখিয়া, অজগরকে কলিকাতার পশুশালায় উপহার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পশুশালার কর্ত্তৃপক্ষগণ একটা ক্ষুদ্র মন্দিরাকার লৌহ-তারের পিঞ্জরে এই অজগরটিকে সযত্নে রাখিয়া সেই মন্দিরের গায়ে উপহার-দাতার নাম লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সর্পটি এ উদ্যানে অনেকদিন যাবৎ ছিল। মধ্যে মধ্যে জ্যোতিবাবু তাঁহার অজগরকে দেখিতে যাইতেন। তাহার পর, একবার গিয়া দেখেন সে পিঞ্জরও নাই—সে অজগরও নাই। শুনিলেন, সেটি মরিয়া গিয়াছে।

আর একবার জ্যোতিবাবু হাতীর উপর চড়িয়া বাঘ শিকার করিতে গিয়াছিলেন। এই তাঁহার প্রথম হাতীর উপরে চড়িয়া বাঘ-শিকারে যাওয়া। একটা ঘন-নিবিষ্ট দুর্ভেদ্য বাঁশ-বনের ভিতর বাঘটা আছে, শুনিলেন। হাতী বড় বড় বাঁশঝাড় মড়্‌মড়্ শব্দে পদদলিত করিয়া সেই দুর্ভেদ্য বাঁশ-বনের মধ্য দিয়া একটা পথ করিয়া চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে হঠাৎ হাতীটি ফোঁস্ করিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া একটু পিছু হটিল। আর অমনি একটা বাঘ লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক বাঁশবন-

অতিক্রম করিয়া মাঠের দিকে দৌড়িয়া পলায়ন করিল। জ্যোতিবাবু হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি আর একটা ঘটনার কথা বলিলেন। তাঁহাদের জমিদারীর হাতীটি শিকারী ছিল না। হাতীতে চড়িয়া শিকার করিতে হইলে, অন্য জমিদারের নিকট হইতে শিকারী হাতী ধার করিতে হইত। তিনি তাহাদের হাতীটিকে শিক্ষা দিয়া শিকারী করিয়া তুলিবেন, সঙ্কল্প করিলেন। প্রথমে তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে বন্দুকের আওয়াজ করিয়া, তাহাকে বন্দুকের আওয়াজে অভ্যস্ত করিতে হইবে। এই মনে করিয়া, তিনি একদিন হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বন্দুকের আওয়াজ করিলেন। হস্তিবরের শিকারশিক্ষার এই প্রথম পাঠ। কিন্তু হস্তী তাহার নিজ হিত বুঝিল না—শিক্ষার মাহাত্ম্য বুঝিল না—সে ঘোর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এমন গা-দোলা দিতে লাগিল যে, জ্যোতিবাবুর সমুদ্রপীড়ার মত পীড়া উপস্থিত হইল। তাহা ছাড়া লম্প ঝম্প দৌড় ছুট প্রভৃতি ব্যায়ামসাধ্য কার্য্যে অনন্যমনা হইয়া এমনি মনোনিবেশ করিল যে, তাহার তাদৃশ অদ্ভুত ব্যবহারে শুভানুধ্যায়ীর প্রাণ পর্য্যন্ত সংশয় হইয়া উঠিল। কপাল দিয়া দর্ দর্ করিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। জ্যোতিবাবু বলিলেন ঃ—

"মাহুৎ অঙ্কুশ প্রহার করিয়া "বয়েঠ" "বয়েঠ" করিয়া বসাইবার কত চেষ্টা করিল, কিন্তু হাতী কিছুতেই সে আদেশ পালন করিল না। আমার আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল—অপরাহ্ণ হইল—তবু মাহুৎ হাতীকে বসাইতে পারে না। আমি ত হাতীর উপর আর তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিতেছি না;—ভয়ে এবং ক্ষুৎপিপাসায় অৰ্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় আমি একেবারে জ্ঞানশূন্য। কি করি, শেষে যাহা থাকে কপালে, নিশ্চেষ্ট হইয়া হস্তীপৃষ্ঠে মৃত্যুর অপেক্ষা, শ্যামল ধরণীক্রোড় এমন কি

হস্তীপদনিষ্পেষণেও, মৃত্যু বাঞ্ছনীয় বলিয়া তাহার লেজ ধরিয়া সর্ সর্ করিয়া ঝুলিয়া পড়িলাম এবং ভূমিতে চরণস্পর্শ হইবামাত্রই প্রাণরক্ষার্থে সবেগে দৌড় দিলাম। মূর্খ হস্তীকে শিখাইতে গিয়া, আমিও এমনি হস্তীমূর্খ বনিয়া গিয়াছিলাম।"

ইহার পর জ্যোতিবাবু হাটখোলায় এক পাটের আড়ৎ খুলিয়াছিলেন। ইঁহার অংশীদার ছিলেন, জ্যোতিবাবুর ভগিনীপতি স্বর্গীয় জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়। দুইজনে প্রতিদিন সকালে হাটখোলায় গিয়া আফিস করিতেন; কিন্তু পাটের বাজার খারাপ হইয়া যাওয়ায় এ কার্য্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। অল্পদিনেই এ ব্যবসায়ে বেশ কিছু লাভও হইয়াছিল। এই টাকা লইয়াই ইহার পর জ্যোতিবাবু শিলাইদহে নীলের চাষ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

পূর্ব্বে শিলাইদহে এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিতে নীলের চাষ উপলক্ষ্যে অনেকগুলি নীলকর সাহেব বাস করিত। এখানে যে নীলকুঠীটি ছিল, সেটি শেষে ঠাকুরজমিদারদের কাছারীগৃহে পরিণত হয়। সেই নীলকুঠী-সংলগ্ন কয়েকখানি ভাঙ্গাচুরা হাউজ (vat) খালি পড়িয়াছিল। জ্যোতিবাবু সেইগুলিকেই মেরামৎ করাইয়া কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিয়া, কার্য্যারম্ভ করিলেন। এই হাউজে জল আনাইতে পদ্মা হইতে একটি খাল কাটান' হইল।

জ্যোতিবাবু বলিলেন, "তখন বুঝিয়াছিলাম চাষার ভাবনা কত! কখন' জল এবং কখন' রৌদ্রের জন্য যে কি আকুলভাবে আমি প্রতীক্ষা করিতাম, তাহা বর্ণনাতীত,—কিন্তু এটা কবির দৃষ্টিতে দেখা নয়। তখন ঈপ্সিত সময়ে মেঘ আসিলে মনে হইত, একজন যেন প্রাণের বন্ধু আসিয়াছে; বন্ধুকে দেখার মতই আনন্দ পাইতাম। এ আনন্দে কাব্যরসের লেশমাত্র ছিল না। এইরূপে চার পাঁচ



শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার B. L.

[১০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ।

বৎসরেই আমার নীলের চাষে খুব উন্নতি হইল। কিন্তু হঠাৎ নীলের বাজার পড়িয়া গেল। শুনা গেল, জার্ম্মানেরা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা এক রকম কৃত্রিম নীল প্রস্তুত করিতেছে, তাহাতেই আসল নীলের বাজার একেবারে খারাপ হইয়া গেল। আমিও কায উঠাইয়া দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। যাহাই হউক, নীলে আমি বেশ লাভ করিয়াছিলাম। এখন এই টাকা লইয়া আমি কি করিব?—এই চিন্তা তখন আমার মনে খুব প্রবল হইয়া উঠিল।

"এই সময় একদিন হঠাৎ Exchange Gazette-এ দেখিলাম, একটা জাহাজের খোল নীলাম হইবে। ভালই হইল, এই খোলটা কিনিয়া একখানা জাহাজ তৈরি' করাইয়া জাহাজ চালান যাইবে, স্থির করিলাম।

"এই সময়ে আবার, কলিকাতা হইতে খুলনা পর্য্যন্ত রেলও হইবে, কথা ছিল। তাহা হইলেই খুলনা হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত বেশ জাহাজ চালান' যাইতে পারে। খোল কেনার পক্ষে এ একটা বেশ সুযুক্তিও হইল। তৎক্ষণাৎ,—সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক বলিতে পারি না—খোলটি যাহাতে হাতছাড়া না হইয়া যায়, এই উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি রয়্যাল এক্স্‌চেঞ্জের দিকে ছুটিলাম।

"সেখানে খুব ভিড়। বিস্তর ক্রেতা। মাল নীলামে উঠিয়াছে, সকলেই ডাকিতেছে, আমিও ডাকিতে সুরু করিলাম। দাম হু হু করিয়া বাড়িতে লাগিল। ক্রমে সাত হাজারে শেষ নিষ্পত্তি হইল। আমিই সর্ব্বোচ্চ ডাকে কিনিলাম। কিনিবার পর অনেকে আমাকে সাতহাজারের উপর আরও কিছু দিয়া এই খোলটি লইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু আমি পুনর্বিক্রয়ে স্বীকৃত হইলাম না। অস্বীকৃত হওয়ার প্রধান কারণ

এই হইল যে, বাঙ্গলায় বাঙ্গালী কর্ত্তৃক আমিই সর্ব্বপ্রথম "জাহাজ-চালান" প্রবর্ত্তন করিব, এই গর্ব্ব। দ্বিতীয়তঃ, সকলেই যখন এ খোলটি কিনিতে উদ্‌গ্রীব তখন নিশ্চয়ই এটি সস্তা হইয়াছে, ক্রয় বিক্রয়ের দিক দিয়া এ কথাটিও তখন খতাইয়া দেখিলাম। অতএব পুনর্বিক্রয়ে ক্ষতি। কথাটা ঠিক! তখন লোকে যদি বলিত "না এটা ঠকা' হয়েছে" তাহা হইলে আমি যে কি করিতাম, তাহা এখন বলা কঠিন। সকলের লুব্ধ দৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া, প্রকাশ্য নীলামে সর্ব্বোচ্চ দরে আমি যে জাহাজের খোল কিনিলাম, ইহাতে আর কোনও লাভ হউক বা না হউক—এই কেনার উত্তেজনাই, সে মুহূর্ত্তে একটা মহৎ গর্ব্ব! যাহাই হউক, জাহাজের খোল কিনিয়া সগর্ব্বে বাটী ফিরিলাম, যেন কি একটা রাজ্যই জয় করিয়া আনিলাম!

"বুশ্‌বী (Bushby) গবর্ণমেণ্টের জাহাজসমূহের একজন ইঞ্জিনিয়ার, তাঁহাকে ষোলটাকা ফী দিয়া এই খোলটি দেখান হইল, তিনি বলিলেন, "It will make a splendid Steamer" (ইহাতে অতি সুন্দর একখানি ষ্টীমার তৈরি হইবে)। আর কি! আমি অমনি হাওড়ায় বড় বড় সব জাহাজের কারখানায় ঘুরিতে লাগিলাম, কে আমার এই জাহাজখানি প্রস্তুত করিয়া দিবে! কিন্তু তাহাদের হাতে এত বেশী কায ছিল যে, বড় বড় কোম্পানির মধ্যে কেহই এ কায লইতে স্বীকৃত হইল না। শেষে Kelso Stewart কোম্পানি এই জাহাজনির্ম্মাণের ভার লইল।—সেই খোলে যে প্রথম জাহাজ প্রস্তুত হইল, তাহার নাম রাখিলাম "সরোজিনী"। জাহাজখানি খুব শীঘ্রই দিবার কথা ছিল, কিন্তু Kelso কোম্পানি তাহা পারিল না। তদ্ব্যতীত জাহাজ বড় হইল বটে, কিন্তু তেমন মজবুত হইল না। সে যেন এক আজন্মরুগ্ন সন্তানের মতই জন্মিল। আজ এঞ্জিন খারাপ, কাল চাকা

খারাপ, পরশ্ব বয়লার খারাপ, এই রকম প্রত্যহই একটা-না-একটা গোলমাল ঘটিতেই লাগিল। আর সেই সব মেরামত করাইতে অজস্র অর্থব্যয় হয়, কাযও বন্ধ রহিয়া যায়। দেশীয় চালক যাহারা ছিল, তাহারা কল-কব্জার বিষয় ভাল বুঝিত না। সামান্য একটু কিছু হইলেই জাহাজ অমনি বন্ধ। আমি বিব্রত হইয়া একজন উপযুক্ত লোক খোঁজ করিতে লাগিলাম। জাহাজের কলকব্জা বিষয়ে অভিজ্ঞ সুদক্ষ মনের-মত একজন ফরাসীকে পাওয়াও গেল, তাহাকেই নিযুক্ত করিলাম। সে-ই জাহাজের Commander হইল। তাহার উপরেই জাহাজের সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিলাম। কল খারাপ হইলেই সে অমনি আস্তিন্ গুটাইয়া যেরূপ অক্লান্তভাবে কায করিত, সেরূপ কায দশ জন খালাসীতেও করিতে পারিত না। কিন্তু তাহার একটি মস্ত দোষ ছিল। মাসের মধ্যে একবার করিয়া সে মাতাল হইত। তখন সে উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া খালাসীদিগকে বক্‌সিশ দিত, খয়রাৎ করিত, জাহাজের সাবানাদি জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া অনেক অপচয় করিত। কিন্তু দুই একদিন পরে, নেশা কাটিয়া গেলেই আবার সে যে-ভাল-মানুষ সেই ভালমানুষ—যারপরনাই বাধ্য। যাহাই হউক, এই ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া আমার যেমন অনেক খরচ বাঁচিয়া গেল, তেমনি অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে কাযকর্ম্মও বেশ সুচারুরূপে চলিতে লাগিল।

"আমি এ লাইনে কায আরম্ভ করিবার খুব অল্পদিন পূর্ব্বে বিলাতই, হইতে Flotilla Company নামে এক কোম্পানি আসিয়া কার্য্য সুরু করিয়া দিয়াছিল। আমি যখন সর্ব্বপ্রথম কার্য্য আরম্ভ করিব স্থির করিয়াছিলাম, তখন যদি পারিতাম তাহা হইলে আমার অনেক সুবিধা হইতে পারিত। কিন্তু প্রথম জাহাজ "সরোজিনী" তৈরি হইতেই এত বেশী বিলম্ব হইয়া গেল যে, আমি আসিবার অব্যবহিত

পূর্ব্বেই ফ্লোটিলাকোম্পানি কায ফাঁদিয়া বসিয়াছিল। আমার জাহাজ যদি ঠিক সময়ে তৈরি হইত, তাহা হইলে আমি ইহার অনেক আগেই কার্য্য চালাইতে পারিতাম; তাহা হইলে হয়ত এ কোম্পানি এদিকে না-ও আসিতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় নাই। এখন আমরা দুই পক্ষই এই একই লাইনে ষ্টীমার চালাইতে লাগিলাম। কাযেই উভয় দলে খুব প্রতিযোগিতাও আরম্ভ হইল। একখানি মাত্র ষ্টীমার লইয়া কার্য্যে অসুবিধা হওয়ায় আমি আরও চারখানি জাহাজ ক্রমে ক্রমে ক্রয় করিলাম। এ জাহাজগুলির নাম ছিল "বঙ্গলক্ষ্মী" "স্বদেশী" "ভারত" এবং "লর্ড রিপন"। তখন এই পাঁচখানি জাহাজ খুল্না হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত যাত্রী লইয়া গমনাগমন করিত এবং সময় সময় মাল লইয়া কলিকাতাও আসিত।

"এ সময় আমি জাহাজেই বাস করিতাম। বাঙ্গালীর জাহাজ-চালনায় তখন বরিশালের ছাত্রসমাজ এবং নব্যদলের মধ্যে একটা প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। তখনকার লিখিত আমার এক খানি পুরাতন পত্র হইতে তাহার কিছু বর্ণনা তুমি পাইতে পারিবে।" পত্রখানির প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—

"আমাদের উভয়ের মধ্যে খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ফ্লোটিলাকোম্পানির অনেক খরচ পত্র—লোক জনের ব্যয়, কিন্তু তারা প্রায়ই যাত্রী পায় না। অধিকাংশ যাত্রীই আমাদের জাহাজে যায়। তাদের বিস্তর ক্ষতি হচ্চে, তবু তারা নিয়মিতভাবে সমানে জাহাজ চালাচ্চে, যন্ত্রের একটু ত্রুটি বা শৈথিল্য নাই। আর তারা প্রকাশ্যভাবে বলে—বাঙ্গালীর অধ্যবসায় নাই। তাহারা আমাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে' কতদিন জাহাজ চালাতে পারবে। এখানে আমাদের জাহাজ যাতে স্থায়ী হয় তার জন্য এখানকার লোকের—বিশেষতঃ ইস্কুলের

ছাত্রদের অপরিসীম উৎসাহ ও যত্ন। এমন উৎসাহ আমি কখনও দেখিনি! তাদের ভাব দেখে চমৎকৃত হতে হয়। প্রত্যহ খুব ভোরে আমাদের জাহাজ এখান থেকে যাত্রী নিয়ে খুলনায় যায়। ফ্লোটিলা কোম্পানির জাহাজও সেই সময় যায়। পাছে আমাদের জাহাজে লোক না গিয়ে প্রতিপক্ষের জাহাজে যায়, এইজন্য কতকগুলি ভদ্রলোক ও স্কুলের ছাত্র রাত্রি ১টার সময় উঠে দলবদ্ধ হয়ে উৎসাহের সহিত জাহাজের ঘাটে প্রত্যহ উপস্থিত হন ও যদি কোন' যাত্রী প্রতিপক্ষের জাহাজে যেতে চায়, তাহাকে অনেক প্রকারে বুঝিয়ে এমন কি পায়ে পর্য্যন্ত ধরে' ফিরিয়ে আনেন। যেখানে জালি বোটে করে প্রতিপক্ষের জাহাজে লোক উঠ্ছে, সেখান পর্য্যন্ত গিয়ে তাদের এইরূপ বুঝাতে থাকেন: "আমাদের কথাটি একবার শুনুন্ তারপর যে-জাহাজে ইচ্ছা হয় যাবেন। আপনারা বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর জাহাজ থাকৃতে কেন আপনারা ইংরাজদিগের জাহাজে যাবেন? দেশের টাকা দেশে থাকে এটা কি প্রার্থনীয় নয়? প্রতিপক্ষের জাহাজে স্বদেশীয়দিগের প্রতি কুব্যবহার করা হ'ত, অপমান করা হ'ত—আমাদের নিমন্ত্রণেই, আমাদের আহ্বানেই, ঠাকুর বাবুরা তাই এখানে জাহাজ এনেছেন—তখন কি আপনাদের ও জাহাজে যাওয়া উচিত?" "হাঁ বটে, যা বল্লে তার উত্তর নাই, চল ঐ জাহাজেই যাওয়া যাক্।" এই বলে যাত্রীরা আবার আমাদের জাহাজে অনেকে ফিরে আসেন। একটি বার-বৎসর বয়স্ক বালক, ঘাটে সেদিন বক্তৃতা দিয়াছিল:—"হে ভাই সকল, তোমরা আপনার জাহাজ থাকৃতে পরের জাহাজে যাইবা না। উহাদের ঐ যে জাহাজ দেখিতেছ—উহার যেরূপ গঠন তাহাতে একটু বেশী বাতাস উঠিলেই দোদুল্যমান হইয়া জলগর্ভে নিমগ্ন হইবে। তাহার সাক্ষী দেখ উহারা এখানে জাহাজ রাখিতে পারে নাই, ওপারে লইয়া

গিয়াছে, এবং সে বাতাসে দোদুল্যমান হইতেছে। যদি তোমরা প্রাণ বাঁচাইতে চাও ত' ভাই-সকল ঐ জাহাজে যাইবা না।"—এই কথা শুনে নীচশ্রেণী লোকদের ভয় হ'ল—আর প্রতিপক্ষের জাহাজে তারা গেল না। ঝড় হোক—বৃষ্টি হোক্—রৌদ্র হোক্—যে কোন' বাধা হোক, কিছুই না মেনে তাঁহারা জাহাজের সিটি (বাঁশীর ডাক) শুন্‌বামাত্র দৌড়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হন্। তাঁহারা বলেন, আমাদের জাহাজের সিটি তাঁহাদের এমন মিষ্টি লাগে ও তা শুন্‌তে পেলে তাঁদের এমন আহ্লাদ হয় যে তাহা বল্‌বার নয়। বন্ধুদের সুপরিচিত গলার স্বর দূর হতে শুন্‌লে যেমন বুঝা যায় কে-আস্‌চে, তেমনি সিটি শুন্‌লেই কোন্ জাহাজ আস্‌চে তাঁরা বুঝতে পারেন। ঐ আজ "ভারত" আসচে, ঐ "লর্ড রিপন" আসচে, ঐ "বঙ্গলক্ষ্মী" আস্‌চে, ঐ "স্বদেশী" আস্‌চে, ঐ "সরোজিনী" আস্‌চে—এই বলে সকলে উৎসাহের সহিত হাস্যমুখে দলবদ্ধ হয়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হন। সেদিন একজন বল্‌ছিলেন, "যেমন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে হৃদয় আকৃষ্ট হত, সেইরূপ তাঁদেরও হৃদয় আকৃষ্ট হয়।" আবার প্রতিপক্ষের জাহাজের নাম পর্য্যন্ত তাঁরা সইতে পারেন না—তার সিটি তাঁহাদের কাণে অত্যন্ত কর্কশ লাগে। প্রতিপক্ষের জাহাজ যদি কোন দিন যাত্রী পায় —সেদিন তাঁদের আর আপ্‌সোসের সীমা থাকে না।

"সেদিন আমাকে অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্য এখানে যে একটি বৃহৎ সভা হয়েছিল, তাতে একটি বক্তা আমার ষ্টীমারের উল্লেখ কর্‌তে কর্‌তে হঠাৎ আপনাকে সম্বরণ করে বল্লেন—তাঁর ষ্টীমার ভুলক্রমে বলেছি—ইহা ত' আমাদেরই ষ্টীমার।" এ কথাটি আমার বড়ই ভাল লেগেছিল। সেদিন সে সভায় অনেক লোক একত্র হয়েছিলেন—একটি প্রকাণ্ড গৃহ লোকে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এখানকার হাকিম, উকীল,



ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

৫১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত।

জমীদার, দোকান্দার, মহাজন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এখানকার প্রধান জমীদার শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করে-ছিলেন। অনেকগুলি সুবক্তাও ছিলেন। সেদিন ছাত্রদের আহ্লাদ ও উৎসাহের সীমা ছিল না। তারা আপনারাই সভার বিজ্ঞাপন ঘরে ঘরে গিয়ে বণ্টন করেছিল, গাছের পাতা দিয়া ঘরটি সুন্দর সাজিয়েছিল। তাদের উৎসাহ দেখ্‌লে নিরাশ প্রাণেও আশার সঞ্চার হয়, নিরুদ্যম হৃদয়েও উদ্যমের ভাব আসে।

"সেদিন এখানে জাতীয় সংকীর্ত্তন হয়েছিল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" অঙ্কিত নিশান হাতে নিয়ে, খোল-কর্ত্তাল বাজাতে বাজাতে বাহু তুলে, উৎসাহের সহিত গান কর্‌তে কর্‌তে সংকীর্ত্তনের দল"—"বাবুর বাড়ী থেকে বৈকালে বেরুলেন্ —যেতে যেতে রাস্তায় লোকের ভিড় বাড়্‌তে লাগল—তারপর বাজারে পৌঁছিলে লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌ল। প্রথমে লোকেরা মনে করেছিল, বুঝি কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংকীর্ত্তন, তাই অ—বাবু একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে এ কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য অল্পকথায় ও সহজ ভাষায় বেশ বুঝিয়ে দিলেন—তাতে লোকেরা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লে ও উৎসাহের সঙ্গে সংকীর্ত্তনে সবাই যোগ দিলে।

"নগর-সংকীর্ত্তনে যে কি মাতান' ভাব, আমি সেদিন বেশ বুঝতে পার্‌লেম্। এইরূপ জাতীয় সংকীর্ত্তন যদি নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে গাওয়া হয়, তা হলে বড়ই উপকার হয়। সাধারণের মধ্যে জাতীয় ভাব-প্রচারের ভাল উপায় এর চেয়ে আর কিছুই নেই। যে গানটা গাওয়া হয়েছিল, সেটা নিম্নে লিখে দিলাম। এই গানটায় লোকেরা যে কি-রকম মেতে উঠেছিল, সুর না শুন্‌লে শুধু কথায় তা বোঝা যাবে না। যাই হোক্ তবু কতকটা ভাব বুঝতে পার্‌বে ঃ—

কে কোথায় আছিস্ ভাই আয়রে সকলে গাই
প্রাণের সঙ্গীত আজি কাঁপায়ে গগন।
বেঁধে আজি প্রাণে প্রাণে শত কণ্ঠে এক তানে
সবে মিলে গাই গীত মৃত-সঞ্জীবন॥

(একতালা)

(ও ভাই) দেখ, সব ঘুমিয়ে অচেতন হয়ে
দেশের দশা একবার করে না স্মরণ।
(একবার চায় না রে কেউ নয়ন মিলে)
(একি রে কাল-নিদ্রা এল)
(মোরা) সবারে জাগাব, দুর্দ্দশা ঘুচাব
নিদ্রাগত প্রাণে আনিব চেতন।
(এ ঘোর দুঃখনিশি অবসানে)
(মহারাণীর সুশাসনে)
(ও ভাই) ভিন্ন ভিন্ন জাতি, মিলে দিবা রাতি,
ভাই ভাই হয়ে করিব সাধন,
(মিলে প্রেমসূত্রে প্রাণে প্রাণে)
দেখবে দেশে দেশে, এ ভারতে মিশে,
কত জাতির হল, প্রেমেতে মিলন।
(ওরে এমন শোভা দেখবে কোথা !

(রূপক)

আহা, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'
ভাবে মেতে কোটি কণ্ঠে কর উচ্চারণ।



স্বর্গীয় মনোমোহন বসু

[১২৮ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত।

(মনোহর সই—একতালা)

শত্রু মিত্র মিলে ঘরের বিবাদ ভুলে
গলাগলি হ'য়ে গাই রে
(আজি) দেশের কাযে মোরা হয়ে মাতোয়ারা
স্বার্থের কথা ভুলে যাই রে
(দেশের প্রেমে মত্ত হ'য়ে)
(মায়ের চরণ সেবায়)
(করি) হয়ে একমন মায়েরই কীর্ত্তন
(মোরা) পঁচিশ কোটী প্রাণী ভাই রে।
বিংশতি জাতিতে বিংশতি ভাষাতে
মেদিনী কাঁপায়ে গাই রে।
(জয় ভারতজননী বলে')
(সমস্বরে সবে)

(রূপক)

নব উদ্যম দেখিয়ে সবে চমকিত হয়ে ক'বে
বুঝি ভারত হবে আবার জগত-ভূষণ।

(ঝুলন)

(ওরে) চারিদিকে সবাই জেগে, তোরাই রলি'
—শুধু তোরাই ঘুমে রলি' শুধু তোরাই ঘুমে রলি' ।
নবীন আলোয় ভাস্‌ছে ধরা দেখ্‌রে নয়ন মেলি।
(চেয়ে দেখ্‌ দেখ্‌রে ও ভাই)
ছি ছি কাযের বেলা ভোরের বেলা ঘুমে বিভোর হলি !

(জেগে আয় আয় রে ভাই)
(ওরে এমন দিন আর পাবিনা রে)
হায় রে ঘুমের ঘোরে বুঝলিনা রে কি ছিলি কি হলি।
(একবার ভেবে দেখ্ রে ও ভাই)
ছি ছি এতকাল ঘুমিয়ে আছিস্ তবু না জাগিলি।
(একি হল রে ভাই)
হায় রে জেগেও বুঝি জাগ্‌লিনা রে কেন এমন হলি।
(একবার উঠ উঠ সবে)
এস মহানিদ্রা ভেঙ্গে করি কোলাকুলি।
(জয় ভারত বল রে ভাই)
এস দলাদলির বাঁধন খুলি বাঁধি গলাগলি।
(ভারত মাতার নিশান তুলি)
(আর দেরি করিস্‌না রে)
(একবার আয় আয় রে সবে)

(রূপক)

সবে একপ্রাণ হয়ে, ভগবানের নামটি লয়ে,
দেশের মঙ্গল সাধনে, কর প্রাণপণ।" (পত্র-শেষ)

"এইরূপে আমার কায বেশ দিন দিন লাভজনক হইয়া উন্নতির পথে চলিতে লাগিল। আমার এই ব্যবসাকে যেন সমস্ত জাতির উদ্যম ভাবিয়া বরিশালবাসীগণ নিয়তই ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেন। আমাকে লইয়া সভা, সমিতি, কীর্ত্তন, বক্তৃতা প্রভৃতি ব্যাপার প্রায় প্রত্যহই লাগিয়া থাকিত। আমিও বেশ মনের সুখে বাস করিতেছিলাম, কিন্তু এত সুখ আমার সহিল না।

"ইংরাজের ব্যবসায়ে ব্যাঘাত লাগিয়াছে, আর কি তাহারা চুপ করিয়া থাকিতে পারে? ব্যবসায়ী সাহেবেরা আমার যৎপরোনাস্তি বিপক্ষতা-চরণ করিতে লাগিল। তাহারা যখন দেখিল যে যাত্রী আর হয় না, তখন তাহারা ভাড়া কমাইতে আরম্ভ করিল,আমিও কমাইলাম। এইরূপে ক্ষতিস্বীকার করিয়াও আমি প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইলাম। লাভ আগে যেমন হইতেছিল তেমন আর এখন হয় না—তবুও আমি দমিলাম না।

"এই সময় খুল্না হইতে মাল বোঝাই লইয়া "স্বদেশী" কলিকাতা আসিতেছিল। সারা পথ বেশ নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল—আলোকমালা সমুদ্ভাসিত কলিকাতা বন্দরেও প্রবেশ করিল। কিন্তু শেষে হাওড়ার পুলের নীচে দিয়া যাইবার সময় একখানা জেটিতে না-কিসে ধাক্কা লাগিয়া ষ্টীমারখানি নিমেষমধ্যে গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হইল। এক জাহাজ মালের এক কণাও উঠিল না।

"এই দুর্ঘটনায় আমি একেবারে নিরুদ্যম ও হতাশ হইয়া পড়িলাম। এতদিন তবুও একটা আশা ছিল—আবার জোয়ার আসিবে। কিন্তু এই-বার সে আশাটুকুও একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। কায উঠাইয়া দিতেই আমি কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিলাম। একেত' প্রতিযোগিতার জন্য কিছু দিন হইতেই আমি ক্ষতিস্বীকার করিতেছিলাম, যদি কোনও রূপে টিকিয়া যায়—এই ভরসায়; কিন্তু এবার এই দুর্ঘটনার জন্য এক ক্ষতি-পূরণ ব্যাপারেই আমি অত্যন্ত জের্‌বার্ হইয়া পড়িলাম, কিন্তু তবুও নিজে হইতে উঠাই কিরূপে? কায বন্ধ করিব মনে মনে এই মৎলব ছিল, কিন্তু এ ব্যাপার ঘৃণাক্ষরেও আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। কায যেমন চলিতেছিল, বাহ্যতঃ তেমনই চলিতে লাগিল।

"এমন সময় ফ্লোটিলাকোম্পানীর পক্ষ হইতে রাজা প্যারীমোহন

মুখোপাধ্যায় (তখনও রাজা হয় নাই) আমার নিকট এক সন্ধির প্রস্তাব লইয়া আসেন। তিনি বলিলেন 'উভয়পক্ষেই আর এরূপ বৃথা অর্থব্যয়ে লাভ কি? আপনি নিজেই একটা মূল্য ধার্য্য করিয়া দিউন্। ফ্লোটিলা-কোম্পানী আপনার সমস্ত কারবার কিনিতে প্রস্তুত আছে।' আমি দেখিলাম যে, এ একটা মহাসুযোগ উপস্থিত—এ সুযোগ ছাড়া একেবারেই উচিত নয়। তখন যেরূপ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে কোন দিন আপনাআপনিই কায গুটাইতে হইত, সে ক্ষেত্রে তাহা হইলে ত কিছুই পাওয়া যাইত না। অতএব এখন বেশ মানে-মানে—উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হউক, যা-হয় কিছু পাওয়াও যাউক। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি মগ্নাবশিষ্ট চারিখানি জাহাজ ও তৎসংক্রান্ত সমস্তই ফ্লোটিলাকোম্পানীকে বিক্রয় করিয়া দিলাম।

"ফ্লোটিলাকোম্পানীর নিকট হইতে যাহা ন্যায্য তাহাপেক্ষা অনেক বেশী টাকা পাইলেও, আমি আমার ঋণপরিশোধ করিতে পারিলাম না। খুব বিপন্ন হইয়া পড়িলাম; শেষে পালিত মহাশয় (স্যর টি পালিত) সমস্ত পাওনাদারদের ডাকাইয়া তাহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া সুজাইয়া দিলেন, তাহাতে আমার ঋণের বোঝা অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরে, তিনি নিজেই এ ভার গ্রহণ করিয়া এমন একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, যাহাতে আমি একেবারেই ঋণমুক্ত হইয়া গেলাম। তিনি এখন দানবীর স্যর তারকনাথ পালিত, তাঁহার পরিচয় কে না জানে? কিন্তু তিনি যে আবার কেমন বন্ধুবৎসল, তাহা তাঁহার এই কাযেই লোক পরিচয় পাইবে। শুধু আমাকে নয়, এমনি কত লোককে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া যে তিনি তাঁহার "তারক" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন, তাহার আর গণনা হয় না।

"তাঁহার দুই সময়ের দুইটি ছবি আমার মনে গভীরভাবে অঙ্কিত



স্বর্গীয় স্তর তারকনাথ পালিত

হইয়া আছে। সেই ছবি দুইখানি তোমার সম্মুখে ধরিলেই, এক মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রকৃত চরিত্র তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রথম ছবি ঃ—আমি তখন হিন্দুস্কুলে খুব নীচের ক্লাসে পড়ি। তিনি একদিন আমাদের ক্লাসের সম্মুখ দিয়া কি কাযে মহেশবাবুর ফার্ষ্ট-ক্লাসে যাইতেছিলেন। দেখিলাম তাঁহার চক্ষে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা। শুনিলাম,মেডিক্যাল কলেজের ফিরিঙ্গি ছাত্রদিগের সহিত প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদিগের একদিন মারামারি হয়। সেইদিনকার মারামারিতে প্রেসিডেন্সী কলেজের দুই একজন ছাড়া সব ছাত্রই পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়। যাঁহারা পলায়ন করেন নাই, তন্মধ্যে পালিতমহাশয়ই সর্ব্বপ্রধান। তিনি একাকী বহু ফিরিঙ্গির সঙ্গে লড়াই করিয়া গুরুতর রূপে আহত হইয়াছিলেন। তবু পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেন নাই। এম্‌নি তাঁহার পৌরুষ-তেজ!

"আর এক ছবি ঃ—তখন আমি স্কুল কলেজ ছাড়িয়া বিষয়কার্য্যে লিপ্ত। সেই সময়ে একবার আমরা বজ্‌রা করিয়া গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। পালিতমহাশয়ও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। গ্রীষ্মকাল। ভয়ানক গরম। আমরা কাম্‌রার পাটাতনে বিছানা করিয়া পাশাপাশি সবাই রাত্রে নিদ্রা যাইতেছি। গরমে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় দেখি, পালিতমহাশয় উঠিয়া বসিয়া আমাকে তালপাতার পাখায় বাতাস করিতেছেন! কারণ, আমি নাকি গরমে খুব ঘামিয়া নিদ্রিতাবস্থাতেই ছট্‌ফট্‌ করিতে ছিলাম, তিনি তাহাই জানিতে পারিয়া ছিলেন। কি স্নেহশীলতা! তাঁহার স্বভাবে কঠোরতা ও কোমলতার কি অপূর্ব্ব-সংমিশ্রণ ছিল!

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি"—

ভবভূতির এই কবি-কল্পনা আমি কেবল পালিতমহাশয়ের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"

ভারত সঙ্গীত-সমাজ-প্রতিষ্ঠা

ও

সংস্কৃত নাটক অনুবাদ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জ্যোতিবাবু এককালে শির-সামুদ্রিক (Phrenology) বিদ্যার খুবই চর্চ্চা করিতেন। এই সময় "সাধনা"য় একবার এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল যে—যে-কোন ব্যক্তি জোড়াসাঁকো বাটীতে আসিয়া জ্যোতিবাবুর নিকট, ৭টা হইতে ১১টার মধ্যে মাথা-পরীক্ষা করাইতে পারিবেন। লোকে হুজুগ্‌ চায়। দুইটি চারিটি দশটি করিয়া ক্রমশঃ লোকসংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। শেষে এত লোক আসিতে আরম্ভ করিল যে, বেলা দুইটা তিনটা পর্য্যন্ত অনবরত পরীক্ষা করিয়াও তিনি শেষ করিতে পারিতেন না।

অনেক দিন হইতে জ্যোতিবাবুর ইচ্ছা ছিল, বিদ্যাসাগরমহাশয়ের ছবি আঁকেন ও তাঁহার মস্তক-পরীক্ষা করেন, কিন্তু এ সুযোগ তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই। "বালকে" বিদ্যাসাগরমহাশয়ের যে ছবি ও মস্তক-পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছিল, সেটা বিদ্যাসাগরমহাশয়ের প্রচলিত বাজারে বিক্রীত ছবি দেখিয়া আঁকা। একদিন কোনও একটি বিবাহ-সভায় জ্যোতিবাবুর সহিত বিদ্যাসাগরমহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। জ্যোতিবাবু তাঁহার অভিপ্রায় জানাইলে, তিনি একদিন জ্যোতিবাবুকে তাঁহার বাসায় যাইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার অল্পদিন পরেই, সমগ্র বঙ্গদেশ এবং বাঙ্গালী জাতিকে কাঁদাইয়া তিনি স্বর্গপ্রয়াণ করেন। জ্যোতিবাবুর এ সাধ আর পূর্ণ হইল না, এজন্য তিনি এখনও দুঃখ করেন।



বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শেষ-শয্যা

জ্যোতিবাবুর সঙ্গীতপ্রিয়তা, Phrenology ও চিত্রাঙ্কন-পটুতা লক্ষ্য করিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ একবার একটি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম (কবিতাটি অপ্রকাশিত) ঃ—

"বেয়ালা কি মিঠে অমৃতের ছিটে
ঐ হাতটিতে শুনায়,
পিয়ানো ঢং ঢং ঢ ঢং ঢং,
সেতার গুন্‌গুনায়।
মাথার তত্ত্ব খুঁজি, পুঁথি করেন পুঁজি,
মাথা পেলে আর কিছু চান না।
ল'ন্ যবে ছবি মনে ভাবে কবি
"হইয়াছে, থামো—আন্না,
চক্ষে আসিয়াছে মোর কান্না!"

জ্যোতিবাবু বলেন, অতিলৌকিক রহস্য-ব্যাপার জানিবার জন্য তাঁহার একবার বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছিল। কোথাও কোনও প্রসিদ্ধ গণৎকার বা ভবিষ্যদ্‌বক্তা বা ঐ জাতীয় একটা-কিছু আসিয়াছে শুনিলেই, তিনি অমনি বন্ধুবান্ধবসহ সেইখানে গিয়া হাজির হইতেন। কিন্তু পনের-আনা ভাগই আন্দাজ ও বাকিটুকু ফাঁকি দেখিয়া অবিলম্বেই তাঁহার সে সখ মিটিয়া গিয়াছিল। কোষ্ঠীর ফলাফলেও তিনি আর বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, 'এ সমস্ত ব্যাপার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-অনুসারে পরীক্ষিত হওয়া উচিত।'

"প্ল্যাঞ্চেটে"র কাণ্ড দেখিয়া, তিনি কখনকখনও খুবই আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "একবার আমার গুণুদাদা এবং ভগিনীপতি যদুনাথ কর্ত্তৃক ধৃত প্ল্যানচেট-কাষ্ঠফলকে কৈলাস মুখুয্যের প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইয়াছিল। কৈলাস মুখুয্যে আমাদের বাড়ীর একজন পুরাতন

কর্ম্মচারী। লোকটি খুরই মজলিসি ও সুরসিক ছিল। তাহার প্রেতাত্মাকে পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা করায়, বলিল :—"আমি কত কষ্ট করিয়া, মরিয়া যাহা জানিয়াছি, আপনারা না মরিয়াই তাহা জানিতে চাহেন কোন সাহসে ? আপনারা ত বড় মজার লোক দেখি ?" তাহার পর অনেক পীড়াপীড়ি করায় সে পরলোক সম্বন্ধে যে দুই চারিটি কথা বলিয়াছিল, তাহা তোমাকে বলিতেছি :—

"আপনারা যাহাকে "ইস্ফীয়ার" (sphere) বলেন, মৃতেরা মৃত্যুর পর সেইরূপ এক-এক ইস্ফীয়ারে গমন করে।"

"সকলেরই যাত্রা-পথ এক।"

"প্রথমে কিছুকাল নিদ্রাবস্থায় থাকে।"

"এখানে, মশায়, আর যাই থাক্, পেটের জ্বালা নাই।"

"যে ঘরে এই সব কাণ্ড হইতেছিল, সেই ঘরে কয়দিন হইতে জমিদারীসংক্রান্ত দরকারী একটা কাগজ খোঁজ করিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। প্রেতাত্মাকে আমরা সেই কাগজখানির সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তর পাইলাম—জলের পাইপ্‌ওয়ালা অমুক ব্যক্তির নিকট খোঁজ করুন, পাবেন। আমরা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। পরে দেখা গেল যে—সেই পাইপ্‌ওয়ালার বিল প্রভৃতি কতকগুলি কাগজের সঙ্গে উক্ত কাগজখানিও ভুলক্রমে চলিয়া গিয়াছিল।"

(এবম্প্রকার সখ যখন মিটিল, তখন জ্যোতিবাবু আবার সঙ্গীতে মনোনিবেশ করেন। সহজ ও সরল প্রণালীতে কিরূপে গানের স্বরলিপি হইতে পারে, এই দিকে তাঁহার দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট হইল। এইজন্য প্রথম প্রথম "ভারতী"তে জ্যোতিবাবু সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপিপদ্ধতি প্রকাশ করিতেন। পরে তাহা অপেক্ষা আরও সহজ সরল এবং শিক্ষার্থীরও বোধগম্য করিবার নিমিত্ত আকার-মাত্রিক স্বরলিপি



শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (যৌবনে)

আবিষ্কার করিলেন। সেগুলি সে সময় "সাধনা"য় প্রকাশিত হইত। এই শেষোক্ত পদ্ধতিই এখন সর্ব্বসাধারণে গৃহীত এবং প্রচলিত।)

এই সময় জ্যোতিবাবু সত্যেন্দ্রনাথের নিকট সেতারায় গমন করেন। সেখানে গিয়া একজন মারাঠী পণ্ডিতের নিকট তিনি মারাঠী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই মারাঠী শিক্ষার ফলে তিনি তৎকালের "সাধনা"য় মারাঠী ও বাঙ্গলা ভাষার তুলনা করিয়া সমালোচনামূলক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দত্তাত্রয় বলবন্ত পারস্‌নীস্ প্রণীত "ঝাঁশি সংস্থান মহারাণী লক্ষ্মীবাই সাহেব হ্যাচে চরিত্র" গ্রন্থ হইতে গ্রন্থকারের অনুমতি লইয়া, তিনি "ঝাঁশির রাণী" লেখেন। "চল্‌রে চল্ সবে ভারতসন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান" এই বিখ্যাত গানটিও এই সময় এই সেতারাতেই রচিত হয়।

জ্যোতিবাবু বলিলেন, "একদিন মেজ'বৌঠাকুরাণী আমায় বলিলেন—'অনেকদিন তুমি নাটক রচনা কর নাই—একখানা নাটক এইখানে লিখে ফেল।' আমি বলিলাম—এখন আমার মাথায় কোন' প্লট্ নাই, লেখা হইবে না। তিনি শুনিলেন না; জবরদস্তি আমাকে একটা ঘরে পূরিয়া, তারকদাদার (স্যর্ পালিতের) কন্যা লীলুকে আমার পাহারায় নিযুক্ত করিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। যতক্ষণ নাটক না লেখা হইবে, ততক্ষণ আর আমার মুক্তি নাই। দায়ে পড়িয়া এইরূপে "হিতে বিপরীত" রচিত হইল। এই ক্ষুদ্র নাটিকাখানি পরে আমাদের বাড়ীতে ও সঙ্গীতসমাজে বহুবার অভিনীত হয়।"

(পুনায় সত্যেন্দ্রনাথের নিকট অবস্থান কালে, তথাকার "গায়ন-সমাজ" দেখিয়া কলিকাতায় তদনুরূপ একটি সভাস্থাপন করিতে জ্যোতিবাবুর ইচ্ছা হয়। কলিকাতায় ফিরিয়া, তিনি "গায়ন-সমাজে"র আদর্শে এক সভা প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইলেন। উদ্দেশ্য—

বাঙ্গলা দেশে সঙ্গীতশিক্ষা, সঙ্গীত অধ্যাপনা, তাহার প্রচার এবং বাঙ্গলার অভিজাত ও মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে সদ্ভাবস্থাপন।

তদনুসারে শীঘ্রই এক অনুষ্ঠানপত্র প্রস্তুত হইল। সকল সংবাদ-পত্রেই এই অনুষ্ঠানপত্র এবং উক্ত সভার উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপিত হইল। দেশের অনেক সুধী এবং দেশহিতৈষী মহাত্মা এইরূপ একটি সমিতি বা সঙ্ঘের অভাব ও তন্নিবারণের আবশ্যকতাও বুঝিলেন। সভাস্থাপন-কল্পে একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইল। চাঁদার জন্য জ্যোতি-রিন্দ্রনাথ ধনীদের দ্বারস্থ হইলেন। কেহ সহস্র, কেহ পঞ্চশত, কেহ বা দুইশত রজতমুদ্রা দান করিবেন বলিয়া স্বাক্ষর করিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ নিজ পরিবার হইতেই দ্বিসহস্রেরও অধিক টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। সভা স্থাপিত হইল, নাম হইল—"ভারত সঙ্গীত সমাজ।"

প্রথমে সমাজ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বাটীতেই বসিত। সকলশ্রেণীর লোকেই এই সমাজের সভ্য হইতে লাগিলেন। সম্মিলিত উদ্যমে এবং ঐকান্তিক আগ্রহে বেশ কায চলিতে লাগিল; সমাজও নিজের উদ্দেশ্যপথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। কোনও গুণীব্যক্তি কলি-কাতায় আসিলেই, এই সমাজে তাঁহার গানবাজনা হইত। কলিকাতার অনেক বড়লোক এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থ নিয়মিতভাবে সভায় যোগদান করিতেন এবং পরস্পর বেশ মেলামেশাও হইত। কিন্তু বাঙ্গালীর সমবেত কার্য্যে দেবতার অভিশাপ আছে, সেই অভিশাপের ফলে অনতিবিলম্বেই মতদ্বৈধ ঘটিল এবং সমাজও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল।

এবারকার দলাদলিতে বেশ গাঢ় রকমের একটু ঢলাঢলিও হইল। একদল অন্যদলকে "সঙ্গীতসমাজ" হইতে নির্ব্বাসিত করিতে চায়, প্রতিপক্ষও "বিনা যুদ্ধে নাহি দিবে সূচাগ্রপ্রমাণ ভূমি" বলিয়া কৃতসংকল্প। ফলে জোর-দখল এবং ফৌজদারী মোকদ্দমা।



সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর I. C. S.

জ্যোতিবাবু তখন পুলিশকোর্টের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্, তিনিও হইলেন সাক্ষী। তুমুল মোকদ্দমা চলিল। যাহা কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল, এই গৃহবিবাদে প্রায় সমস্তই ব্যয়িত হইল। প্রথম দল মোকদ্দমায় হারিয়া গৃহচ্যুত হইলেন।

বিজেতারা সিংহমহাশয়ের বাটীতেই আখ্ড়া চালাইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ সদ্য সদ্য মোকদ্দমা জিতিয়া যেরূপ উৎসাহ ছিল, পরে কর্পূরের মত সেটা উবিয়া গেল—যেমন আমাদের সকল কাযেই গিয়া থাকে।

জ্যোতিবাবু বলিলেন—"হারিয়া অবধি অন্য দলের উৎসাহ দ্বিগুণ উদ্দীপিত হইল; অন্যত্র বাড়ী ভাড়া লইয়া সেইখানে "ভারত সঙ্গীত-সমাজ" নামে সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল। এখনও সেই বাড়ীতেই "ভারত সঙ্গীত-সমাজ" চলিতেছে। এবার এ-দলের পৃষ্ঠপোষক হইলেন, কুমার মন্মথনাথ মিত্র। মিত্র মহোদয়ের সাহায্যেই সঙ্গীত-সমাজ হারিয়াও জিতিয়াছিল, এবং আজও তাহা সেই পাষাণভিত্তির উপরেই দণ্ডায়মান। কুমার প্রথম হইতেই সঙ্গীত-সমাজকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন; তাঁহার সহানুভূতি ভিন্ন আজ পর্য্যন্ত কখনই ইহার অস্তিত্ব থাকিত না। তবে সঙ্গীত-সমাজ আপনার উদ্দেশ্য যে কতদূর সফল করিয়াছে—তাহা দেশের জনসাধারণ বিচার করিবেন।")

সঙ্গীত-সমাজে "অশ্রুমতী" "পুনর্ব্বসন্ত" "বসন্তলীলা" "হিতে বিপরীত" "অলীকবাবু" প্রভৃতি বইগুলি বহুবার অভিনীত হইয়াছিল।

সঙ্গীত-সমাজের সহিত জ্যোতিবাবুর সম্বন্ধ যখন খুব ঘনিষ্ট, সেই সময়ে দোয়ার্কিনদিগের ব্যয়ে "বীণাবাদিনী" নামে, তিনি সঙ্গীতবিষয়ক একখানি মাসিকপত্র সম্পাদন করেন। এখানি বৎসর-দুই চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়।)

তাহার পর ত্রিপুরার স্বর্গীয় নৃপতি রাধাকিশোর মাণিক্য-দেববর্ম্মন্ বাহাদুর জ্যোতিবাবুকে সঙ্গীতবিষয়ক আর একখানি মাসিকপত্র সম্পাদন

করিতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধক্রমেই জ্যোতিবাবু তখন "ভারত সঙ্গীত-সমাজ" হইতে ("সঙ্গীত-প্রকাশিকা" নামে সঙ্গীতবিষয়ক একখানি মাসিকপত্র বাহির করেন। মহারাজা বাহাদুর ইহার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ মাসিক ৫০৲ টাকা করিয়া অর্থসাহায্য করিতেন। কাগজ খানি দশ বৎসর ছিল। মহারাজা বাহাদুরের আকস্মিক ও শোচনীয় মৃত্যুর পর বর্ত্তমান মহারাজার সাহায্যেও কিছুদিন চলিয়াছিল। পরে তিনি এই অর্থসাহায্য রহিত করায়, কাগজও বন্ধ হইয়া যায়।)

জ্যোতিবাবু "সঙ্গীত-সমাজের" সংস্রবে থাকিতে থাকিতেই, সংস্কৃত নাটক গুলিকে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া ফেলেন। তিনি বলিলেন, "একদিন মেজ'বৌঠাকুরাণী আমাকে "শকুন্তলা" পড়িতে বলিলেন। ইহার আগে আমি সংস্কৃত নাটক একখানিও পড়ি নাই। "শকুন্তলা" পড়িয়া আমি বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ভাবিলাম, এ জিনিষ এখনও কেন বাঙ্গলা ভাষায় তর্জ্জমা হয় নাই। দুই এক জনকে অনুবাদ করিতে অনুরোধও করিয়াছিলাম। কিন্তু কেহই তেমন গরজ করিলেন না। আমি নিজেই আরম্ভ করিয়া দিলাম।"

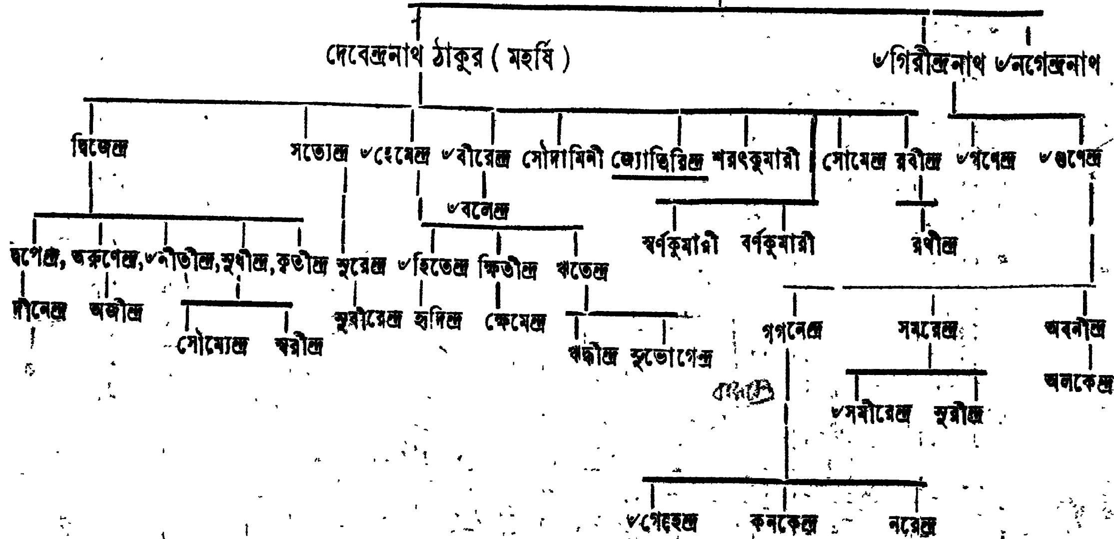
১৩০৬ হইতে ১৩১১ সালের মধ্যেই যথাক্রমে "অভিজ্ঞান-শকুন্তলা" (১৩০৬), "উত্তর-চরিত" "মুদ্রারাক্ষস" "রত্নাবলী" "মালতী-মাধব" (১৩০৭), "প্রবোধ-চন্দ্রোদয়" "বেণী-সংহার" "মহাবীর-চরিত" "মালবিকাগ্নিমিত্র" "বিক্রমোর্ব্বশী" "চণ্ড-কৌশিক" (১৩০৮) "নাগানন্দ" (১৩০৯) "বিদ্ধশাল-ভঞ্জিকা" "ধনঞ্জয়-বিজয়" (১৩১০) "কর্পূর-মঞ্জরী" ও "মৃচ্ছকটিক" (১৩১১) অনুবাদিত ও প্রকাশিত হয়।

বেদব্যাসের বিশ্রাম

জ্যোতিবাবু বলিলেন,—"ক্রমে ক্রমে আমার বাল্যসহচর বন্ধুবান্ধব, একে একে সকলেই ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। অবশেষে কৃষ্ণবিহারীও চলিয়া গেলেন। মধ্যে, কৃষ্ণবিহারীর সঙ্গে বড় একটা দেখা সাক্ষাৎও হইত না; কিন্তু ইদানীং তাঁহার সহিত আমার বন্ধুত্ব যেন আরও গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ী আসিতেন। আমরা ছাদের উপর মাদুর পাতিয়া দুইজনে মুখোমুখী বসিয়া মন খুলিয়া খুব গল্প করিতাম। একদিকে তাঁহার যেমন অগাধ পাণ্ডিত্য, অন্যদিকে তেমনি আবার তাঁহার হৃদয়ও স্নেহমমতায় পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহার অসাধারণ মনের বল ও আশ্চর্য্য কষ্টসহিষ্ণুতা ছিল। যখন তাঁহার সায়েটিকা রোগের যন্ত্রণা বাড়িয়া উঠিত, তখন তিনি "ইণ্ডিয়ান মিরারে"র জন্য ইংরাজি প্রবন্ধ লিখিয়া, সেই যন্ত্রণা ভুলিয়া থাকিতেন। তাঁহার বাঙ্গলা লেখা অভ্যাস ছিল না—কিন্তু পরে, সাধনার বলে, বাঙ্গলা লেখাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন। বাঙ্গলাভাষায় "অশোক-চরিত্র" প্রভৃতি গ্রন্থ কৃষ্ণবিহারীরই রচনা।"

জ্যোতিবাবু স্বাস্থ্যলাভের জন্য ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার রাঁচী আসিয়াছিলেন। বারকয়েক রাঁচী আসা-যাওয়াতে, রাঁচী তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল। তাহার ফলেই তিনি এখানে এখন "শান্তিধাম" নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন।

জীবন কথা শেষ করিয়া তিনি বলিলেন, "যতদূর মনে পড়িল, তাহা ত' বলিলাম। এখন এইখানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম! তোমার পাঠকেরাও হয়ত হাঁপ্ ছাড়িয়া বলিবেন—'রাম বল, বাঁচ্লাম'।"


দ্বারকানাথ ঠাকুর
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহর্ষি)
৺গিরীন্দ্রনাথ
৺নগেন্দ্রনাথ
দ্বিজেন্দ্র
সত্যেন্দ্র
৺হেমেন্দ্র
৺বীরেন্দ্র
সৌদামিনী
জ্যোতিরিন্দ্র
শরৎকুমারী
সোমেন্দ্র
রবীন্দ্র
৺গণেন্দ্র
৺গুণেন্দ্র
৺বলেন্দ্র
স্বর্ণকুমারী
বর্ণকুমারী
রথীন্দ্র
দ্বিপেন্দ্র, অরুণেন্দ্র, ৺নীতীন্দ্র, সুধীন্দ্র, কৃতীন্দ্র
সুরেন্দ্র
৺হিতেন্দ্র
ক্ষিতীন্দ্র
ঋতেন্দ্র
গগনেন্দ্র
সমরেন্দ্র
অবনীন্দ্র
দীনেন্দ্র
অজীন্দ্র
সৌম্যেন্দ্র
স্বরীন্দ্র
সুবীরেন্দ্র
হৃদিন্দ্র
ক্ষেমেন্দ্র
ঋদ্ধীন্দ্র
সুভোগেন্দ্র
অলকেন্দ্র
৺সমীরেন্দ্র
সুব্রীন্দ্র
৺গেহেন্দ্র
কনকেন্দ্র
নবেন্দ্র



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৮৭ বৎসর বয়সে)

পরিশিষ্ট

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্ম-কথা

১৭৬৫ শকের, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ (সন ১২৫০ সালে, ১লা ভাদ্র তারিখে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৭৬১ শকে (১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে "তত্ত্ববোধিনী সভা" নামে এক সভাস্থাপন করেন; সে সভার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের মর্ম্ম বাঙ্গালী জনসাধারণের উপযোগী করিয়া দেশে তাহার সুপ্রচার করা। এতৎকল্পে সেই সঙ্গে সঙ্গে "তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা" নামে একটি পাঠশালাও খোলা হইল—যাহাতে কেবল বাঙ্গলা ভাষাই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এ পাঠশালায় আর অন্য কোনও ভাষার অধ্যাপনা হইত না।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে পাদ্রী ডফ্ রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ সাহায্যে স্বপ্রতিষ্ঠিত স্কুলের পত্তন করিলেন। ডফ্ সাহেব তাঁর তেত্রিশ বৎসর খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের (১৮৩০—১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে দুই বার য়ুরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করে' অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করেন। সেকালে য়ুরোপ ও আমেরিকাতে খৃষ্টীয়েতর ধর্ম্মকে, বিশেষত হিন্দুধর্ম্মকে, অতি জঘন্য মূর্ত্তিতে চিত্রিত করে' খৃষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করলে, তথাকার দানশীল ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বভাবতই খ্রীষ্টধর্ম্মের সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে, বিস্তর অর্থ-সাহায্য করতেন। পূর্ব্বাপর প্রায় সকল মিশনরীই এই সহজ উপায়ে আপনাপন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাহায্যকল্পে অর্থ-সংগ্রহ করতেন। ডফ্ সাহেবও এমন সহজ উপায়ের আশ্রয়গ্রহণে দ্বিধা করেন নাই। ১৭৫৬ শকে (১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে) প্রথমবার স্বদেশে ফিরে যান এবং সেখানে ১৭৬১ শকে (১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে) India

and India's missions (ভারত ও ভারতের ধর্ম্মসম্প্রদায় সকল) প্রবন্ধে হিন্দুধর্ম্ম এবং তৎসম্বন্ধে কৃতজ্ঞতার পাশ কাটাইয়া, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তীব্র আক্রমণ ও কটূক্তি বর্ষণ করিতে কুণ্ঠিত হন নি।

এই ঘটনায় দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে খুবই আঘাত লাগিয়াছিল। তাঁর হৃদয়ে ডফ্‌সাহেব কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজের প্রতি নিন্দাবাদের প্রতিবাদ কর্‌বার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু সে সময়ে না ছিল এমন কোন কাগজ যাতে তিনি আপনার মনোভাব সকল ব্যক্ত কর্‌তে পার্‌তেন, আর না ছিল এমন কোন বন্ধুবান্ধব যাদের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে পরামর্শ কর্‌তে পার্‌তেন। ১৭৬১ শকে (১৮৩৯ খৃঃ) তত্ত্ববোধিনী সভা সবেমাত্র স্থাপিত হয়েছিল। পরে যখন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্মিলনের ফলে তত্ত্ববোধিনী সভা সুপ্রতিষ্ঠিত হোল এবং সেই সঙ্গে অন্তত ছোটখাটো একটি দল বেঁধে গেল, তখন দেবেন্দ্রনাথ একখানি মাসিকপত্র প্রকাশের প্রস্তাব কর্‌তে সাহসী হলেন। এই পত্রিকার নাম হোল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ১৭৬৫ শকের ১লা ভাদ্র ইহার শুভ জন্মদিবস।

নামে অবশ্য ইহা তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র এবং সেই সভার তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহা দেবেন্দ্রনাথের নিজস্ব ছিল—তিনিই ইহার সমুদয় ব্যয়ভার বহন কর্‌তেন। এই পত্রিকাপ্রকাশ করায়, দেবেন্দ্রনাথের অল্প সাহস ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় নি। সে সময়ে বঙ্গসাহিত্যের এবং বঙ্গসাহিত্যপ্রিয় পাঠকেরও সম্পূর্ণ অভাব ছিল। দেবেন্দ্রনাথের এটা বেশ জানা ছিল যে, এই পত্রিকাদ্বারা বঙ্গসাহিত্যও যেমন গ'ড়ে তুলতে হবে, তেমনি বঙ্গসাহিত্যের পাঠকেরও সৃষ্টি কর্‌তে হবে। বঙ্গদেশের পক্ষে এরূপ একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করা বল্‌তে গেলে একটি সম্পূর্ণ নূতন ঘটনা। যে সকল উদ্দেশ্য নিয়ে পত্রিকা জন্মগ্রহণ করেছিল, পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই একটি ঘোষণাপত্রে সেই

উদ্দেশ্যগুলি বিবৃত হয়েছে। কি উচ্চআদর্শ নিয়ে যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাহা সেই ঘোষণাপত্রেই সুপরিস্ফুট রয়েছে।

পত্রিকার সেই উদ্দেশ্যপরিচায়ক ঘোষণাপত্র নিম্নে উদ্ধৃত হোল—

"কোন নূতন পত্রপ্রকাশ হইলে, সেই পত্রপ্রকাশের তাৎপর্য্য অবগত হইতে অনেকে অভিলাষ করেন, অতএব তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা যে অভিপ্রায়ে এতৎপত্রিকার সৃষ্টি করিলেন, তাহার স্থূল বৃত্তান্ত এ স্থলে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

"তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য পরস্পর দূর দূর স্থায়ী প্রযুক্ত,সভার সমুদয় উপস্থিত কার্য্য সর্ব্বদা জ্ঞাত হইতে পারেন না, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন এবং উন্নতি কি প্রকারে হইবেক? অতএব তাঁহাদের এ সকল বিষয়ের অবগতি জন্য এই পত্রিকাতে সভার প্রচলিত কার্য্যবিষয়ক বিবরণ প্রচার হইবেক।

"অনেক সভ্য দূরদেশবশত বা শরীরগত অসুস্থতাহেতু বা কোন কার্য্যক্রমে অথবা অন্য কোনও দৈববিপাকে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে অশক্ত হয়েন, বিশেষত তাঁহাদিগের নিমিত্ত উক্ত সমাজের ব্যাখ্যান, সময়ে সময়ে এই পত্রিকাতে প্রকটিত হইবেক।

"মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে এইক্ষণে সাধারণের আকাঙ্খা হইয়াছে এবং অনেকে তাহার মর্ম্ম জানিতে বাসনা করেন, অতএব সেই সকল গ্রন্থ এবং অন্য যে কোন গ্রন্থ, যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে, তাহা এই পত্রিকাতে উদ্ধৃত হইবেক।

"পর-ব্রহ্মের উপাসনার প্রকার এবং তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং সর্ব্বোপাসনা হইতে পরব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা জানাইবার নিমিত্ত আমাদিগের শাস্ত্রের সার মর্ম্ম সংগৃহীত হইবেক।

"বিচিত্র শক্তির মহিমাজ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশিত হইবেক।

"কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।

"বৈষয়িক সম্বাদপত্রে পরমার্থঘটিত রচনাপ্রকাশের প্রথা না থাকাতে অনেক জ্ঞানীব্যক্তি আপনাদিগের অভিলষিত রচনা প্রকাশ করিতে অশক্ত ছিলেন। অতএব এই পত্রিকাপ্রকাশ হইয়া তাঁহাদিগের সেই খিন্নতা এইক্ষণে নিবৃত্ত হইল এবং সর্ব্বসাধারণসমীপে মনোগত জ্ঞানালোকের প্রকাশ হইবার বিলক্ষণ উপায় হইল।

"এই অমূল্য পত্রিকা তাহার চিরজীবন, একবৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রতি-মাসের প্রথম দিবসে উদিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের এবং তাহার বন্ধুদিগের মনোরঞ্জন করিবেন। যদি তাহারদিগের স্নেহের দ্বারা এই পত্রিকার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়,তবে তৎকালে ইহার সমাচার দেওয়া যাইবেক।"

পত্রিকাতে রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী এবং অন্যান্য ব্রহ্মজ্ঞান প্রসঙ্গী গ্রন্থপ্রকাশের কথা বড়ই সময়োপযোগী ও শিক্ষিতমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। রামমোহন রায়ের জীবিতকালে এ-দেশবাসী অনেকে তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর দেহান্তরপ্রাপ্তির পর এ-দেশের শিক্ষিতমণ্ডলী তাঁর মহত্ত্ব উপলব্ধি করে, তাঁর প্রতি সম্মানপ্রদর্শনে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর প্রতি যে দেশের লোকের একটা টান হয়েছিল, তাহা উপরোক্ত ঘোষণাপত্র থেকে স্পষ্ট প্রকাশ পায়। তাই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী প্রকাশের কথা শিক্ষিতসম্প্রদায়ের কাছে বড়ই উপাদেয় লেগেছিল। তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যগণের কাছে পত্রিকা বিনামূল্যে প্রেরিত হইত।



স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর

ঘোষণাপত্রের আরও দু'একটি বিষয় শিক্ষিত পাঠকসম্প্রদায়ের এবং সমগ্র হিন্দুসমাজের প্রীতিদৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থে আমাদের শাস্ত্রের সারমর্ম্ম সংগ্রহ করা তাদের অন্যতর।

এইখানেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এবং সঙ্গে-সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সাম্প্রদায়িক ভাব দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু এর ফলে ব্রহ্মসভার পক্ষপাতী ও বিরোধী উভয় সম্প্রদায়ের বিবাদ-বিসম্বাদ ঘুচে গিয়ে মিলনের পথ প্রশস্ত হোল। শাস্ত্র-সাহায্যে ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন কর্‌বার কারণে আমাদের জাতীয় সম্মান পরিরক্ষিত হোল এবং সঙ্গে-সঙ্গে পত্রিকাও হিন্দুসমাজের আদরের সামগ্রী হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আর একটি বিষয়ের সূত্রপাত করে বঙ্গের তদানীন্তন শিক্ষিতসমাজকে চমকিত করে তুলেছিল। বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানের বিষয় নিয়মিতরূপে আলোচনা কর্‌তে প্রবৃত্ত হওয়া সে-কালের লোকদের কাছে খুবই নূতন বোধ হয়েছিল। ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা ও অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ কর্‌বার অঙ্গীকারসূত্রে বিজ্ঞানবিষয়ক নানা প্রবন্ধ সচিত্র হয়ে পত্রিকার অঙ্গ ভূষিত কর্‌তে লাগ্‌ল। আমরা জানি যে সেকালে বঙ্গের শিক্ষিত-মণ্ডলীর অনেকে এই সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশ প্রতীক্ষা করে থাক্‌তেন। তাঁরা প্রথম প্রথম বিশ্বাসই কর্‌তে পারেন নি যে বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সুচারুরূপে লেখা যেতে পারে।

এই উন্নত ঘোষণাপত্র সম্মুখে রেখে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে স্বীয় কর্ত্তব্যসাধন করে চল্‌তে লাগ্‌ল। দেবেন্দ্রনাথ একটি বৎসর কারো সঙ্গে কোন প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদে নামেন নি। প্রথমে তাঁর আশাই ছিল না যে, পত্রিকা এক বৎসরেরও জন্য লোকের হৃদয়-রঞ্জক হয়ে চল্‌তে পার্‌বে। কিন্তু এক বৎসরের পরিবর্ত্তে পত্রিকা নির্ব্বিঘ্নে

দুই বৎসর কাটিয়া গেল এবং পত্রিকার মতামতের উপর লোকে শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে লাগল। ডফ্ সাহেব হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের উপরু গালাগালি বর্ষণ করেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ সেটা ভুলতে পারেন নি। যখন, বলতে গেলে, পত্রিকার পাঠক, তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য এবং ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষিত সভ্য নিয়ে একটি সম্প্রদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হোল, তখন দেবেন্দ্রনাথ ডফ্ সাহেবের সেই "India and India's Missions" পুস্তিকার প্রতিবাদে "Vedantic doctrines vindicated" এবং "Rational analysis of the Gospel" নামক দুইটি প্রবন্ধ লিখে পত্রিকায় প্রকাশ করেন। শুনেছি যে, শেষোক্ত প্রবন্ধে খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব খণ্ডিত হয়েছে দেখে ডফ্ সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, তার নাম দিয়েছিলেন "The irrational paralysis of the Gospel"। পূর্ব্বেই বলে এসেছি যে, ডফ্ সাহেবের প্রচারগুণে তদানীন্তন শিক্ষিত-মণ্ডলীর অনেকে খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। কেহই আশা করতে পারেননি যে, কোন' শিক্ষিত ভারতবাসী আবার হিন্দুধর্ম্মের সমর্থনে লেখনীধারণে অগ্রসর হবেন। উপরোক্ত দুইটি প্রবন্ধপ্রকাশের ফলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শক্তিমত্তা শিক্ষিতসমাজে স্বীকৃত হোল। আর ডফ্ সাহেবের সঙ্গে বাদানুবাদের ফলে, তত্ত্ববোধিনী সভার এবং সেই সভা যে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছিল, সেই ব্রাহ্মসমাজেরও জাতীয় হিন্দুভাব পরিস্ফুট হয়ে পড়ল। এইরূপে নানা উপায়ে বলতে গেলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই এদেশে প্রথম জাতীয় ভাবের পত্তন করে দেয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যে সকল উপায়ে বঙ্গসাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিল, গ্রন্থ-সভা সেই সকল উপায়ের অন্ততর। পত্রিকা প্রথম প্রকাশ হবার কিছুকাল পরে "এসিয়াটিক সোসাইটী"র প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনে এক "গ্রন্থ-সভা" (Paper

Committee) সংস্থাপিত হোল। সেই সভাতে কোন্ কোন্ প্রবন্ধ পত্রিকাতে প্রকাশের উপযোগী, তাহাই বিবেচিত হোত। পাঁচ জনের বেশী এই সভার সভ্য "গ্রন্থাধ্যক্ষ" থাকা নিয়ম ছিল না। একজন গ্রন্থাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করলে, অপর একজন মনোনীত হয়ে তাঁর স্থান অধিকার করতেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু, শ্রীধর বিদ্যারত্ন, রাধাপ্রসাদ রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সমসাময়িক স্বনামধন্য মহোদয়গণ এই সভার সভ্য ছিলেন। সভার নিয়ম এই ছিল যে, পত্রিকার জন্য প্রেরিত প্রবন্ধ অধিকাংশের মনোনীত হলে, প্রয়োজন মত পরিবর্ত্তন সহকারে পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। অন্যের কথা দূরে থাকুক—বিদ্যাসাগর মহাশয় বা দেবেন্দ্রনাথের রচিত প্রবন্ধও অধিকাংশ সভ্যের সম্মতিক্রমে প্রকাশিত হোত।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার স্থায়িত্বলাভের প্রধান কারণ একটি মুদ্রাযন্ত্র লাভ। মাসিকপত্র স্বল্পব্যয়ে নিয়মিত প্রকাশ করতে ইচ্ছা করলে নিজের একটি মুদ্রাযন্ত্র নিতান্তই আবশ্যক। প্রয়োজন বুঝে, রমাপ্রসাদ রায় অক্ষরাদি উপকরণসহ একটি মুদ্রাযন্ত্র তত্ত্ববোধিনী সভাকে প্রদান করেছিলেন। এই মুদ্রাযন্ত্র ব্রাহ্মসমাজের যে কি পর্য্যন্ত উপকার সাধন করেছে, তার ইয়ত্তা হয় না। সময়ে সময়ে এই মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে লব্ধ অর্থের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের প্রাণরক্ষা হয়ে গেছে। আজও এই মুদ্রাযন্ত্রটি আদিব্রাহ্মসমাজের আয়ের পথ উন্মুক্ত রেখেছে। কলিকাতার হেদুয়াতলার যে বাড়ীতে রামমোহন রায়ের স্কুল বসিত, সেই বাড়ীতে তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয় প্রথম স্থাপিত হয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করলেই অক্ষয়কুমার দত্তের কথা স্বতই মনে আসে। পত্রিকার প্রথমাবস্থার সঙ্গে অক্ষয়কুমার

দত্তের জীবনের কথা অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত। প্রথম অবধি দ্বাদশ বৎসর কাল একাদিক্রমে অক্ষয়বাবু পত্রিকার সম্পাদনকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। বলা বাহুল্য যে, সম্পাদকের ক্ষমতার উপরেই যে কোন সম্বাদপত্র বা সাময়িক পত্রের উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে। অক্ষয়বাবুর মত সম্পাদক না পেলে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শিক্ষিতসমাজে নিজ শক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারত কি না সন্দেহ। অক্ষয়বাবুকে নির্ব্বাচিত করে পত্রিকার সম্পাদনে নিযুক্ত করবার জন্য, বঙ্গদেশ দেবেন্দ্রনাথের নিকট ঋণী। পত্রিকাসম্পাদক তখন গ্রন্থসম্পাদক নামে অভিহিত হতেন। দেবেন্দ্রনাথই গ্রন্থসম্পাদকের বেতন বহন করতেন। বোধ হয় সেই কারণে, পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথেরই মতানুযায়ী প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হোত, অন্তত তাঁর মতবিরোধী কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত না।

অক্ষয়বাবুকে গ্রন্থসম্পাদক পদে নিয়োগ সম্বন্ধীয় কথাটি এই :—"কোন্ ব্যক্তিকে ইহার (পত্রিকার) সম্পাদকতার ভার অর্পণ করা যায়, এই গুরুতর বিষয়টি সভার বিবেচ্য হইলে, অবশেষে স্থিরীকৃত হইল যে প্রার্থীগণ 'বেদান্ত ধর্ম্মানুরাগী সন্ন্যাসধর্ম্মের এবং সন্ন্যাসীদিগের প্রশংসা-বাদ' এই বিষয়টি অবলম্বন করিয়া এক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করিবেন। যাহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তিনিই সম্পাদকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। ভবানীচরণ সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহার প্রতিযোগিতা হয়। অক্ষয়-বাবুর প্রবন্ধটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইল, ইনিই ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন।"

দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের রচনা "অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর" বলিয়া উল্লেখ করিয়া, বলিয়াছেন—"আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইঁহার দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা

সম্পাদন করিতে পারিব। ফলতঃ তাহাই ঘটিল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয়বাবুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার মত-বিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। * * * * ফলতঃ আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম।"

উনিশ বৎসর বয়সে অক্ষয়কুমারের পিতৃবিয়োগ হয়। সে জন্য তাঁহার সাংসারিক অবস্থা আরও খারাপ হওয়ায়, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া লেখাপড়া পরিত্যাগ করিতে হয়। স্কুল ছাড়্‌বার পর অক্ষয়বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষকতায় নিযুক্ত হয়েন। এই সময়ে তিনি মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও বাসগ্রামের গোপীনাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে সংবাদ-প্রভাকরসম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুরোধে বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে আরম্ভ করেন। একদিন অবসরমত ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহাকে দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভায় আনিয়া, তাঁহাকে সভ্যশ্রেণী ভুক্ত করিয়া দেন। পরে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হইলে, অক্ষয়কুমার আট টাকায় আরম্ভ করিয়া, দুই এক মাসের মধ্যেই চৌদ্দ টাকা বেতনে তাহার শিক্ষক পদে নিযুক্ত হয়েন। এই সময়ে তিনি একখানি ভূগোল রচনা করেন। ১৬৭৪ শকে (১৮৪২ খৃষ্টাব্দে) তিনি টাকীর প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় "বিদ্যা-দর্শন" নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহা ছয় মাস কাল মাত্র জীবিত ছিল। ১৭৬৫শকে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বাঁশবেড়ে গ্রামে স্থানান্তরিত হইলে, অক্ষয়বাবু সেখানে যাইতে অস্বীকার করেন। অবশেষে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ হইলে, তিনি

মাসিক ষাঠ টাকা বেতনে ইহার সম্পাদকতায় নিযুক্ত হয়েন। অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে এত স্নেহ চক্ষে দেখিতেন যে, পরে তিনি পত্রিকার কারণে দেড়শত টাকা বেতনের পদও গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। ১৭৭৭শক পর্য্যন্ত দ্বাদশ বৎসর কাল তিনি পত্রিকার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৭৭৭শকে কলিকাতা নর্ম্মালস্কুল স্থাপিত হইলে ঘটনাচক্রে পড়িয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে তাহার প্রধান শিক্ষকের পদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই বৎসর অবধিই তিনি শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়া, বালী গ্রামে গঙ্গাতীরে বাস করিতে থাকেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন দ্বারা অক্ষয়বাবুর আয় কিছুই অধিক হইত না, কিন্তু তিনি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কার্য্যান্তর পরিহার পূর্ব্বক, নিয়তই উহার উন্নতিবর্দ্ধনার্থ চেষ্টা করিতেন। ঐ চেষ্টা সফল করণাশয়ে স্বয়ং নানাবিধ ইংরাজী গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন, এবং মেডিক্যাল কলেজে গমন করিয়া দুই বৎসর কাল রসায়ণ ও উদ্ভিদ্-শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ জন গ্রাহক ছিল। তাহা: কেবল এক অক্ষয়বাবুর দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময়ে পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই দেবেন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রধান স্মৃতিস্তম্ভ।

[১৩২২ সালের ভাদ্রের (৮৬৫ সংখ্যক) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি. এ, তত্ত্বনিধি মহাশয় লিখিত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও অক্ষয়কুমার দত্ত"প্রবন্ধ হইতে লেখক মহাশয়ের অনুমতিক্রমে সঙ্কলিত।]

সমাপ্ত